আইডি ৪৪
মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধে গাইবান্ধা

ভূমিকাঃ ব্যবসায়িক অজুহাতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নামে এই উপ-মহাদেশে ইংরেজদের আগমন ঘচে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটিয়ে তারা গোটা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা দখল করে। ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা হারিয়ে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করে এবং মূলতঃ তখন থেকেই এ দেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার চেতনার সূত্রপাত ঘটে। এরই ফলশ্রুতিতে একে একে সংঘটিত হতে থকে সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, টংক আন্দোলন, নানকার আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন।

প্রায় দু'শ বছর শাসন এবং শোষণ করার পর বৃটিশরা ১৯৪৭ সালে চলে যাওয়ার আগে চক্রান্তের মাধ্যমে বৃটিশ শাসিত গোটা ভারতবর্ষকে তিন অংশে ভেঙ্গে দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করে দিয়ে যায়। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে ভারত গড়ে উঠলেও সাংবিধানিকভাব ভারত কখনো হিন্দু রাষ্ট্র হয়নি। কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় তা সাংবিধানিকভাবেই মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পরিণত হয়। দ্বিজাতিত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা পাকিস্তানে শুরু থেকেই বাঙালিরা সর্বক্ষেত্রে শোষণ, বঞ্চনা ও উপক্ষোর শিকার হতে থাকে।

পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছরের মধ্যেই উর্দুকেই রাষ্টা ষাভা হিসেবে ঘোষণা কর বাঙালির উপর ভাষার বোঝা চাপানোর চেষ্টার সাথে সাথে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন। সৃষ্টি হয় বাঙালি জাতির সংগ্রামী ঐতিহ্যের চেতনা একুশে ফেব্রুয়ারী। শহীদ হন- সালাম, জববার, রফিক, বরকত, সালাহউদ্দিন প্রমুখ। এই রক্তস্নাত আন্দোলনের ফলে ৫৪-এর নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটিয়ে বিজয়ী হয়। কিন্তু চক্রান্ত করে কিছু দিনের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে। পরবর্তীতে ৫৮ সালে সামরিক আইন জারির এক মাসের মধ্যে আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসেন। ৬২ তে সামরিক আইন ও শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন ৬৬-এর ৬ দফার আন্দোলন, ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনের পরিণতিতে '৬৯ সালে পাকিস্তানের শোষণ ও বৈষম্যমূলক শাসনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। এই সকল আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। আইয়ুবের বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে এবং আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাপকতা এবং বাস্তবতা বিবেচনা করে ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন সাধারণ নির্বাচনের। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে বিজয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ৩১৩ আসন-বিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে শুরু হয় টালবাহানা এবং চক্রান্ত। ৭১ সালের ১ মার্চ পূর্ব ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে সারা পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফুর্ত গণবিক্ষোভ ঘটে। এই গণঅভ্যুত্থান অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত হয়। পূর্ব বাঙরার সর্বত্র প্রশান যন্ত্র অচল হয়ে যায়। ৬ মার্চ হরতাল পালিত হয়। ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করন-'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ৯ই মার্চ পল্টন ময়দানে জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীনতা ঘোষণার সমর্থনে ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সরা পূর্ব বাংলার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।ান্য ককে পাকিস্তানীরা প্রস্তুতি নিতে থাকে। বাঙালিদের উপর সশস্ত্র আক্রমণের। ২৫ শে মার্চের কালরত্রিতে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা, ইপিআর বাহিনীর সদর দফতরে আক্রমণের মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করা হলেও স্বতঃস্ফুর্ত পররোধ গড়ে উঠে। পাকিস্তানী আক্রমণের সাথে সাথে অধিকাংশ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের ৭ই মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা হয়ে ওঠে এক অভ্রান্ত পদ নির্দেশ। বিদ্রোহী বাঙালি স্মলণকালের ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পুলিশ ও ইপিআরসহ সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। চট্টগ্রামে চালু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সেখান থেকে ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। ২৭ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে জিয়ার কণ্ঠে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা জনগণকে উদ্দীপ্ত করে। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীর তত্ত্বাবধানে সারাদেশকে এগারিট সেক্টরে বিভক্ত করে শুরু হয় আমাদের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম।

স্বাধxীনতা যুদ্ধে গাইবান্ধা ঐতিহাসিক এবং গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে গাইবান্ধাবাসীর প্রস্তুতি, প্রতিরোধ, যুদ্ধে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন গৌরবময় অবদান এই নিবন্ধে উপস্থাপন করা হলোঃ

প্রাথমিক প্রস্তুতিঃ একাত্তরের ৩ মার্চ ঢাকায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের পর থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো আরম্ভ হয়, যা স্বাধনিতা আন্দোলনের অংশে পরিণত হয়। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তির আকাংখা তীব্রতর হতে থাকে। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে সর্বত্র পাকিস্তানী পতাকা উড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়। আর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে দেশ জুড়ে প্রতিরোধ দিবস। ঐদিন গাইবান্ধায় পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২৩ মার্চ সকাল থেকে পাবরিক লাইব্রেরী মাঠে ছাত্র জনতার সমাবেশের প্রস্তুতি চলতে থাকে। দুপুরে ছাত্রলীগের তৎকালীন মহকুমা সভাপতি এম এন নবী লালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ নেতা নির্মলেন্দু বর্মন, মোহাম্মদ খালেদ, ছাত্রলীগের মহকুমা সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আরেফিন তারেক, সৈয়দ শামস-উল আলম হিরু, সদরুল কবীর আঙ্গুর, আমিনুল ইসলাম ডিউক প্রমুখ। বক্তৃতা শেষে সমাবেশেই পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংরার পতাকা উড়ানো হয়। এ সময় এম এন নবী লালু পতাকা ধরে থাকেন এবং নাজমুল আরেফিন তারেক পতাকায় অগ্নিসংযোগ করেন। পরে এম এন নবী লালু, নাজমুল আরেফিন তারেক, রিয়াজুল হক বিরু, আব্দুল হাদি মুন্না, শাহ শরিফুল ইসলাম বাবলু, আব্দুস সালাম, নির্মলেন্দু বর্মন ভাইয়া ও আরো অনেকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের সর্বত্র পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। গাইবান্ধা কলেজের অধ্যাপক আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী এবং অধ্যঅপক মাজহারুল মান্নানকে যুগ্ম আহবায়ক করে গঠিত শিক্ষক সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে ২৪ মার্চ শহরে মিছিল ও সমাবেশ হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই গঠিত হয় মহকুমা সংগ্রাম কমিটি। এর নেতহৃত্বে ছিলেন আওয়াম লীগড় নেতা লুৎফর রহমান, বাংলাদেশের প্রথম স্পীকার শাহ আব্দুল হামিদ, সোলায়মান মন্ডল, ডাঃ মফিজুর রহমান, আবু তালেব মিয়া, এ্যাডভোকেট শামসুল হোসেন সরকার, জামালুর রহমান, ওয়ালিউর রহমান রেজা, আজিজার রহমান, নির্মলেন্দু বর্মন, মতিউর রহমান, হাসান ইমামা টুলু, মোহাম্মদ খালেদ, নাট্যকর্মী গোলাম কিবরিয়া, তারা মিয়া প্রমুখ। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন অবাঙ্গালী মহকুমা প্রশাসক, ব্যাংক কর্মকর্তা রেজা শাজাহান প্রশাসনিকভাবে সংগ্রাম কমিটিকে সহযোগিতা করেন। এর পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি চলতে থাকে। নৌবাহিনী থেকে ছুটিতে আসা কাজিউল ইসলাম, বিমান বাহিনীর আলতাফ, আজিম উদ্দিন, আলী মাহবুব প্রধান প্রমুখ গাইবান্ধা কলেজ ও ইসলামিয়া হাইস্কুল মাঠে যুবকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। এ প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গাইবান্ধা কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অহিদ উদ্দিন আহমেদ।

এ সময় হাসান ইমাম টুলুর সাহসী ভূমিকায় গাইবান্ধা ট্রেজারী তেকে প্রায় দুইশত রাইফেল বের করে নিয়ে ছাত্র জনতার মধ্যে বিতরণ করা হয়। আনসার ক্যাম্প থেকেও কিছু রাইফেল নেয়া হয়। সুবেদার আলতাফ হোসেন তার অধীনস্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের নিয়ে দেশ মুক্ত করার সংগ্রাম সংগঠিত করতে গাইবান্ধা চলে আসেন। আলতাফ সুবেদার নামে এই সাহী যোদ্ধা গাইবান্ধা কারাগার থেকে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেন এবং স্বাধনিতা যুদ্ধে অঙশগ্রহণের আহবান জানান। শহরের বিভিন্ন স্থানে চলতে থাকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। অন্যান্য থানাগুলোতেও চলতে থাকে মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি। সাঘাটা থানা সদরের বোনারপাড়া হাইস্কুল মাঠে তৎকালীন গাইবান্ধা মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক ও বোনারপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ আতাউর রহমানের উদ্যোগে ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরের সহস্রাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে অস্ত্র চালনা ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর প্রশিক্ষকরা নিয়োজিত ছিল। প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনায় সহযোগিতা করেছিলেন মনসুর রহমান সরকার, মজিবর সিআইডি, রোস্তম আলী খন্দকার, আফছার, গৌতম. বজলু, তপন, রাজ্জাক সহ আরও অনেকে।

বোনারপাড়া জিআরপি থানা ও সাঘাটা থানা হতে রাইফেল-গুলি সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা ও বোনারপাড়ায় প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। রাইফেল সংগ্রহে অধ্যক্ষ আতাউর রহমান, এবারত আলী মন্ডল, রোস্তম, আফছার বজলু ছাড়াও অনেকে ছিলেন। আনসার কমান্ডার আফতাব হোসেন দুদুর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আসনার বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে এক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করা হয়। এই দলে মহববত, বজলু, দুদু সহ আরও অনেকে ছিল। এই দল

বোনারপাড়া প্রতিরোধের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল সরকারি খাদ্য গুদামের ৩নং বাসাটি। বোনাপাড়ার প্রবেশ মুখে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য পরিখা খনন করা হয়। গাইবান্ধা-বোনারপাড়া সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে গাছ কেটে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। বোনারপাড়ায় মুক্তিবাহিনীর এই সকল পদক্ষেপের খবরে হানাদার বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ট্যাংক কামানে সজ্জিত হয়ে ১৭ এপ্রিল গাইবান্ধা পতনের ৭দিন পর ২৩ এপ্রিল বোনাপাড়ায় আসে। ট্যাংক কামান সজ্জিত বিশাল বাহিনীকে সামান্য ৩০৩° রাইফেল দিয়ে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হবে বিবেচনায় এনে হানাদার বাহিনীর অগ্রাভিযানে বাঁধা দেয়া হতে মুক্তিবাহিনীকে বিরত রাখা হয়। ২৩ এপ্রিল বোনারপাড়ার পতন ঘটে।

ছাত্র-যুবকরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে চলে যায়। প্রশিক্ষণ শেষে সাঘাটা থানার ছেলেরা ১১টি সেক্টরে জেড ফোর্স, কে ফোর্স ও মুজিব বাহিনীর অধীনে সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রতিরোধ পর্বঃ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক পলাশবাড়িতে ৮মার্চ পিয়ারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হাসান আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তোফাজ্জল হোসেনকে আহবায়ক ও ওমর ফারুক চৌধুরীকে সদস্য সচিব এবং এম কে রহিম উদ্দিন (বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের স্বাধনিতা ঘোষণাকারীদের অন্যতম), আইয়ুব আলী মাস্টার, আব্দুল বারেক, সাকোয়াত জামান বাবু, মোফাজ্জল হোসেন, রাখাল চন্দ্র, আব্দুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান, ডাঃ নিজাম মন্ডল, অরজিৎ কুমার, আব্দুল ওয়ারেছ, গোলজার ব্যাপারী, নজরুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান প্রমুখকে নিয়ো 'হানাদার বাহিনী প্রতিরোধ' কমিটি গঠিত হয়। কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন আজিজার রহমান এমপিএ। এই কমিটি ১০ মার্চ এফইউ ক্লাবে একটি শিবির খোলে এবং পাকিস্তানী পতাকার স্থলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। ১২ মার্চ ঢাকা থেকে রংপুরগামী পাকিস্তানী বাহিনীর গাড়ি চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি করার জন্য রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হয়। পাকিস্তানীরা ব্যারিকেড সরিয়ে রংপুর গেলেও কমিটির উদ্যোগে পাকিস্তানী সৈন্যদের যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ২৭ মার্চ রংপুর থেকে বগুড়াগামী পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পলাশবাড়ি এলাকার মহাসড়কের বেরিকেড ভাঙতে না পেরে গাড়ি থেকে পলাশবাড়ির কালিবাড়ি হাটের নিরীহ জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করে। হানাদারদের গুলিতে গিরিধারী গ্রামের তরুণ আঃ মান্নান এবং দুজন বাঙালি পুলিশ নিহত হন।

২৮ মার্চ সীমান্ত এলাকা থেকে ৪০/৫০ সদস্যের ইপিআর বাহিনী পলামবাড়িতে আসে। তাদের সাথে হানাদার বাহিনীর সংঘর্ষে ২১ জন শহীদ হন। পাকিন্তানী হানাদার বাহিনীর দোসর মেজর নিজাম অবশিষ্ট বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করে এবং জানতে পায় ২৫ মার্চ সৈয়দপুর সেনানিবাসে বাঙালি সৈনিকদের উপর হামলা হওয়ায় তারা সশস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে গেছে এবং ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন ফুলবাড়িতে অবস্থান নিয়েছেন। মেজর নিজাম ফুলবাড়ি গিয়ে পাকিস্তানী প্রীতি লুকিয়ে রেখে ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে দুর্বল করার জন্য ঘোড়াঘাটে অবস্থানরত ডি কোম্পানীর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে কিছু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণের পরামর্শ দেয়। পরামর্শ অনুযায়ী ২৯ মার্চ তারিখে সুবেদার আফতাব আলী ওরফে আলতাফকে ৬০জন সৈন্যসহ প্রেরণ করা হয়। দূরদর্শী ক্যাপ্টেন আনোয়ার সুবেদার আলতাফকে পলাশবাড়িতে অবস্থানের নির্দেশ দেন। সেনাদলকে নিয়ে পলাশবাড়ির বীর ছাত্র-যুবক-জনতা আরো বেশী সাহসী হয়ে ওঠে। সুবেদার আলতাফ তার বাহিনীকে বিভিন্নভাগে ভাগ করে মাদারগঞ্জ ও আংরার ব্রীজে নিয়োজিত রাখেন। তাঁরা পলাশবাড়িতে ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণও তদারক করেন। সংগ্রাম কমিটি সেনাবাহিনী ও ইপিআর জোয়ানদের আর্থিক সহযোগিতা করতে থাকেন। ৩০ মার্চ মেজর নিজামের পাকিস্তানী প্রীতি উন্মোচিত হয়। সে সকলকে ক্লোজ হতে ও অস্ত্র জমা দিয়ে বিশ্রামে যেতে বলে। কিন্তু সেনাবাহিনীর দামাল সন্তানরা চক্রান্ত বুঝতে পারেন। সৈনিকদের গুলিতে মেজর নিজাম নিহত হলে লেঃ রফিক নেতৃত্ব লাভ করেন।

৩১ মার্চ পলাশবাড়িতে পাক হানাদারা আবারো প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বাঙালি ইপিয়ার ও সেনাবাহিরন জোয়ানদের সাথে গুলি বিনিময় হয়। এক সময় হানাদার বাহিনী পলাশবাড়ি চৌরাস্তায় উপস্থিত হয। সেখানে ছিলেন লেঃ রফিক। হানাদাররা তাকে ধরে গাড়িতে উঠাতে চেষ্টা করলে সুবেদার অরতাফের সঙ্গী হাবিলদার মনছুর গ্রেফতারকালদদের উপর এলএমজি দিয়ে গুলি চালায়। একজন পাকিস্তানী সৈন্য লেঃ রফিককে পিস্তল দিয়ে গুলি করে। পাবনার নারিন্দা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজিজ ও ফাতেমা বেগমের দামাল সন্তান লেঃ রফিক শহীদ হন। নেতৃত্ব পান সুবেদার আলতাফ। সুবেদার আলতাফ পলাশবাড়ি এলাকার মুজাহিদ আনসারদের আহবান জানান স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সাথে যোগ দিতে। কয়েকদিনের মধ্যে ক্যাপ্টেনসহ ২৫০ জন মুজাহিদ, আনসার তাদের সাথে যোদ দেন। সুবেদার আরতাফের নেতৃত্বাধীন বাহিনী পীরগঞ্জের আংরার ব্রীজ, সাদুল্যাপুরের মাদারগঞ্জ ও গোবিন্দগঞ্জের কাটাখারী ব্রীজসহ পলাশবা[[ড়ড় থানা সদরে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৪ এপ্রিল ভোরে সশস্ত্র হানাদার বাহিনী ৩০/৩৫টি কনভয় নিয়ে ঢাকা থেকে পলাশবাড়ির উপর দিয়ে রংপুর যায়। ১৫ এপ্রিল রাত আটটায় হানাদার বাহিনী আংরার ব্রীজে পাহারারত বাঙালি সৈনিকদের উপর হামলা চালায়।

দীর্ঘ সময়ের তুমুল লড়াইয়ের খবর আসে গাইবান্ধায়। গাইবান্ধা থেকে প্রশিক্ষক কাজিউল ইসলামসহ অন্যান্য প্রশিক্ষক যোদ্ধারা প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পলাশবাড়ি ছুটে যান ও যুদ্ধে অংশ নেন। আংরার ব্রীজের যুদ্ধে পাঞ্জাবী হানাদাররা পিছু হটে যায়। তখন হাবিলদার মনছুরের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন ছিল মাদারগঞ্জে। সুবেদার আলতাফ ভোর রাতে আংরার ব্রীজ ভেঙ্গে দিয়ে কয়েকজন বীর যোদ্ধা নিয়ে রওয়ানা দেন মাদারগঞ্জে। মাদারগঞ্জে পৌঁছে সুবেদার আলতাফ প্রায় ৫০ গজ দূর থেকে লক্ষ্য করেন ৫/৬টি মেশিনগান সংযোজিত গাড়ি থেকে পাঞ্জাবীরা নেমে অবস্থান নিচ্ছে। গাড়িগুলো একটু সরে গিয়েই মেশিনগানের গুলি ছুড়তে থাকে। সুবেদার আলতাফ তড়িৎ ফিরে এসে পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করেন এবং সেনাসদস্যসহ মুক্তিপাগল প্রশিক্ষণার্থীরা শত্রু নিধনে একযোগে গুলি ছুড়তে থাকেন। শত্রুরা দুদিক থেকে হামলা কর এগুতে থালে সুবেদার আলতাফ ও হাবিরদার মনছুর বীর জোয়ানরে নিয়ে দুদিক থেকে হানাদারদের উপর পাল্টা হামলা চালায়। এসময় প্রায় দুহাজার বীর জনতা দা, বল্লম ও লাঠি হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। মুক্তিযোদ্ধারা আরও বেশি সাহসী হয়ে উঠেন। যুদ্ধে ২১ জন পাঞ্জাবী নিহত হয়। হানাদার বাহিনী ক্রমশঃ পিছু হটতে থাকে। নিহত ও আহতদের ফেলে রাখা ১৭টি রাইফেল ও একটি এলএমজি মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয। যুদ্ধে বীর বাঙালি নূরুল আমিন আহত হন। তাঁকে মাদারগঞ্জ থেকে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এ সময় খবর আসে হানাদার পাঞ্জাবী সৈন্যরা শঠিবাড়ি হয়ে গাইবান্ধা অভিমুখে এগুচ্ছে। পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে হানাদারদের অস্ত্র ও সামরিক শক্তির মোকাবেলা সম্ভব নয় বলে সকল শক্তি একত্রিত করে মুক্তিযোদ্ধারা গাইবান্ধায় অবস্থান নিতে ছুটে আসেন। গাইবান্ধায় অবস্থান নেয় বীর মুক্তিযোদ্ধারা। পাক হানাদার বাহিনী ভারী ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসহ গাইবান্ধা শহরের দিকে আসতে থাকে। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা গাইবান্ধা শহর ত্যাগ করে। মুজিবনগরে যে দিন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় সেই দিন (১৭ এপ্রিল) বিকেল ৩টায় পাক হানাদার বাহিনী গাইবান্ধা শহরে প্রবেশ করে। মুক্তি সেনানীরা শহর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায় এবঙ সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের মুক্তির জন্য পুনরায় প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণঃ গাইবান্ধার বীর সন্তানেরা ছড়িয়ে পড়ে কুড়িগ্রামের রৌমারী, রাজিবপুর ও চিলমারীর মুক্ত এলাকায় এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পাড়ের নিরাপদ স্থানে। গাইবান্ধার নির্বাচিত প্রতিনিধির অনেকেই বিএসএফ (সীমান্ত নিরাপত্তারক্ষী) এর সাথে যোগাযোগ করে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য ছুটে যাওয়া দামাল সন্তানদের সংগঠিত করে তাদের আশ্রয় ও মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য তৎপর হন। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে সীমান্ত এলাকায় যুবকদের সংগঠিত এবং প্রশিক্ষণের জন্য তৎপর হন। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে সীমান্ত এলাকায় যুবকদের সংগঠিত এবং প্রশিক্ষণের জন্য ১১০টি যুব অভ্যর্থনা শিবির খোলা হয়। এরমধ্যে মানকারচরের স্মরণতলী এবং কুচবিহারের খোচাবাড়ি শিবিরের কাম্প-ইনচার্জের দায়িত্ব পান গাইবান্ধার দুই এমপিএ যথাক্রমে ডাঃ মফিজুর রহমান এবং ওয়ালিউর রহমান রেজা। শিবিরগুলোতে নবাগতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গাইবান্ধার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের আরও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। গাইবান্ধার প্রশিক্ষণ সংগঠকদের অন্যতম আলী মাহবুব প্রদান ও আনসার কমান্ডার আজিম উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে বড়াইবাড়িতে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ওদিকে বড়াইবাড়ি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মানকার চরে অবস্থানরত এমএনএ এবং এমপিএ সহ নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় পরিচালিত বড়াইবাড়ি ক্যাম্প থেকে ব্যাপক প্রশিক্ষণের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাকড়ীপাড়ার প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়। ভারতের বিএসএফ অ্ম সহযোগিতায় উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য কাকড়ীপাড়া ক্যাম্প থেকে ১ম ব্যাচ হিসেবে ১১৩জনকে ভারতের তুরা পাহাড়ে প্রেরণ করা হয়। কাকড়ীপাড়ায় প্রাশকি প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে। তুরায় চলে ১১৩ জনের গেরিলা প্রশিক্ষণ। সাদুল্যাপুর উপজেলাধীন কামারপাড়া স্কুল মাঠে এবং ঘাগোয়া ইউনিয়নের রূপারবাজার, গিদারী ইউনিয়নের কাউন্সিলের বাজার প্রভৃতি স্থানে মার্চ মাস থেকেই যারা স্থানীয় উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন তারা হানাদার বাহিনীর তৎপরতায় ছত্রভঙ্গ কাকড়ীপাড়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও সীমান্ত এলাকার অন্যান্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলে যান। এসময় মুক্তিযুদ্ধ বেগবান হতে থাকে এবং মুক্তিযোদ্ধারা সফলতা অর্জন করতে থাকে। ক্রামন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের বিবরণঃ

স্থান	উদ্যোগ/নেতৃত্ব	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষণার্থী
কাউনিয়া স্কুল	লুৎফর রহমান এম এন এ এবং আবু তারেব মিয়া		১০০

	এমপিও		
মোল্লারচর	মতিউর রহমান মহির মাস্টার এবং বাকী মিয়া	আনসার কমান্ডার মমতাজুল ইসলাম	
কামারপাড়া		আনসার কমান্ডার খগের আলী ইঃ বেঃ নইম পিএনজি নাজির উদ্দিন পিএনজি এবং আনসার কমান্ডার নূর আলম	৫০০
দক্ষিণ হাট বামুনী	ভেমরুল ক্লাব	আনসার কমান্ডার- আব্দুল গফুর, আনসার আলী ও জোববার	মোজাম্মেল, বদিয়া, নুরুল আলম আঃ জোববার, নূরুল ইসলাম সহ বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা বয়েজ উদ্দিন (পালোয়ান) মনোকঞ্চন, রাজ্জাক, মজিদ, বক্কর ও আরও অনেকে
রূপারবাজার	ইনামুল হক মন্ডল	আনসার আফিল উদ্দিন রউফ মধু এবং আঃ সাগর	
মালিবাড়ী গোডাউন বাজার	নূরুল ইসলাম আকন্দ সামছুল হুদা ও সামাদ আকন্দ	জিআরপি'র সহকারী দারোগা বদর উদ্দিন আপ্তাব উদ্দিন ও সরবেশ আলী	
বোনারপাড়া কিউ এ এ হাইস্কুল (টি এস এম) মাঠ	অধ্যক্ষ আতাউর রহমান	আফতাব হোসেন দুদু (মথরপাড়া)	

এছাড়া উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য অনেক মুক্তিযোদ্ধা ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে পুনরায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ফুলছড়ি থানা সদরে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীর সদস্য অবাঙালিরা গলনার চরকে 'জয়বাংলা' বলে আখ্যায়িত করেছিল। কেননা মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাইড আউট ছির গলনার চরে। বিশেষ করে রোস্তম কোম্পানীর অস্থায়ী কোম্পানী হেড কোয়ার্টার ছিল গলনার চরে। গলনার চর থেকেই গাইবান্ধার অভ্যন্তরের অনেক অপারেশন পরিচালিত হয়েছিল। এই কোম্পানীর অস্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল এখানে। বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্র-যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে এখানে এনে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠানো হতো। বিভিন্ন অপারেশন শেষে মুক্তিযোদ্ধারা এখানে সমবেত হতো। ভারত থেকে দেশে আসার পথে ও দেশ থেকে ভারতে যাওয়ার পথে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা দল এখানে যাত্রাবিরতি করতো। গলনার চরে বসেই রোস্তম কোম্পানীর অনেক অপারেশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতো। গলনার চরের প্রতিটি মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতো।

এরপর যুক্ত করা যায় মোল্লার চরের নাম। মোল্লারচর ছিল মুক্তাঞ্চলের সবচেয়ে নিরাপদ হাইড আউট। বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার ট্রানজিট প্লেস এই মোল্লার চর। বিভিন্ন মুক্তিযো্দ্ধা দল যাওয়া আসার

পথে এখানকার হাইস্কুলে যাত্রাবিরতি করতো। এখানকার চেয়ারম্যান আব্দুল হাইয়ের বাড়িতে অনেক নেতা কর্মী আপ্যায়িত হয়েছেন। তারপরও মুজিবনগর সরকারের একটি ছোট কাস্টম অফিস ছিল। ভারতে যাওয়া পাট বোঝাই নৌকা হতে ডিউটী আদায় করা হতো। সংগৃহীত টাকা সরকারের তহবিলে জমা হতো। অফিসের দায়িত্বে ছিলেন গাইবান্ধার সিও (রাজস্ব) পরবর্তীতে এসি জনাব সেতাব উদ্দিন বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট হাসান ইমাম টুলু, এবারত আলী মন্ডল ও এ্যাডভোকেট ফজলে রাববী। এর অদূরে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হামিদ পালোয়ানের ক্যাম্প ছিল।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও অপকর্মঃ ১৭ এপ্রিল হানাদার বাহিনী গাইবান্ধায় প্রবেশ করে হত্যা করে মাদারগঞ্জ প্রতিরোধ যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আমিনকে।

পাকিস্তানী বাহিনী গাইবান্ধা স্টেডিয়ামে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এখান থেকেই যুদ্ধকালীন সময়ে গোটা গাইবান্ধার মুক্তিকামী, নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা, নারী ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনা তৈরী এবং আক্রমণ পরিচালনা করা হতো। এইসব বর্বরোচিত কাজে সহায়তাকারী এদেশীয় দালালরা ছাত্র-যুব-জনতাকে হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিলে নরপশুরা নির্মমভাবে তাদের হত্যা করতো এবং মা-বোনদের ধর্ষণের পর হত্যা করতো। গাইবান্ধা প্রবেশের পরপরই হানাদার বাহিনী তাদের দালালদের মারফত খবর পেয়ে ছুটে যায় কামারপাড়ায়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। কামারপাড়া যাবার পথে হানাদাররা লক্ষ্মীপুরে মুক্তিকামী ৫জন বাঙালি সন্তানকে হত্যা করে। হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করার পাশাপাশি গোটা গাইবান্ধায় বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু করে। পাশাপাশি অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও নারী ধর্ষণ করে নরপশুরা বিভিষীকার রাজত্ব কায়েম করেছিল। পাকিস্তানী বাহিন পলাশবাড়িতে সিএন্ডবি ডাক বাংলোয় ঘাঁটি গাড়ে। সেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে মুক্তিকামী মানুষ ধরে এসে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করতে থাকে। অন্যান্য থানাতেও তারা ঘাঁটি বানিয়ে অপকর্ম চালায়।

রণাঙ্গণের সুঃসাহসিক যুদ্ধঃ ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে সামরিক অফিসারদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। মেজর জিয়ার নেতৃত্বে জেড ফোর্স গঠন করা হয়। গাইবান্ধা অঞ্চল ছিল এই জেড ফোর্সের অধীন। সেপ্টেম্বরে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে জেড ফোর্স সিলেট অঞ্চলে চলে গেলে এ অঞ্চলে গড়ে ওঠে ১১নং সেক্টর। এতে নেতৃত্ব দেন মেজর তাহের। উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১১৩জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে মানকার চরের কামাক্ষা মন্দিরের টিলায় ১১নং সাব সেক্টরের গোড়া পত্তন ঘটে। এই সাব সেক্টরের কমান্ডারের দয়িত্ব পান বিমান বাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ শফিক উল্ল্যা এবং পরবর্তীতে ফ্লাইট লেঃ হামিদুল্লাহ খান। কামালপুরে সম্মুখ যুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার মেজর তাহের গুরুতর আহত হলে মাহিদুল্লাহ খান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। এই সাব সেক্টরের উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন খায়রুল ইসলাম ওরফে নজরুল ইসলাম, এম.এস নবী লালু, রোস্তম আলী, মাহবুব এলাহী রঞ্জু, আমিনুল ইসলাম সুজা, ছোট নূরু, মবিনুল ইসলাম জুবেল, মোজাম্মেল হক মন্ডল, রফিকুল ইসলাম হিরু, বজলার রহমান, মহসীন, গৌতম, সামচুল আলম, বজলু, বন্দে আলী, মান্নান, নাজিম, বক্কর, তোফা, আহসান, কাসেম, হায়দার, মজিবর, জিন্নু, মহববত প্রমুখ। এদের মধ্যে এম এন নবী লালু, খায়রুল আলম, মাহবুব এলাহী রঞ্জু, রোস্তম আলী কোম্পানী কমান্ডারের দায়িত্ব পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অপারেশন শুরু করতে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তৎকালীন গাইবান্ধা মহকুমার অধিকৃত এলাকা এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপাড়ের মুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত কালাসোনা গাইবান্ধা থেকে মাত্র ৬/৭ মাইল দুরে মানস নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এই দ্বীপটি উত্তর রণাঙ্গণে যুদ্ধ কৌশলের অন্যতম একটি অস্থায়ী ঘাঁটি। এই ক্যাম্প থেকে গাইবান্ধার বিভিন্ন এলাকার শত্রুর উপর অভিযান পরিচালিত হতো। ঐ দ্বীপাঞ্চলটির বিভিন্ন স্থাপনা মিলে ১১নং সেক্টরের একটি গেরিলা কোম্পানী দক্ষতার সাথে অবস্থান নিয়েছিলো এবং প্রায় প্রতিদিন নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর উপর আক্রমণ রচনা বা আক্রমণ প্রতিহত কর নিজেদের অবস্থান আরও সংহত করেছে। এখানে কিছু দুঃসাহসিক যুদ্ধের বর্ণনা উপস্থাপন করা হলোঃ

১। বাদিয়াখালী সড়ক সেতু এলাকার যুদ্ধঃ মাহবুব এলাহী রঞ্জু ও রোস্তম আলীর নেতৃত্বাধীন দুটি সেকশন এল এম, জি, স্টেনগান, এস এল আর, রাইফেল ও গ্রেনেড নিয়ে যৌথভাবে গাইবান্ধা উপজেলাধীন বাদিয়াখালী রোড-ব্রীজ এলাকার অভিযান পরিচালনা করেন। নৌকাযোগে তারা ব্রীজের কাছে পৌছেন। ব্রীজ ঘিরে ছিল শত্রু সেনাদের বাংকার। এসব বাংকারে হানাদার সৈন্য ও রাজাকাররা ভারী অস্ত্র নিয়ে পাহারারত ছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধারা আধঘন্টা সময়কাল একটানা গুলি বর্ষণ করে শত্রু সেনাদের উপর। উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হলেও ব্রীজটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে নেয়া সম্ভব হয়নি। এ পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান থেকে ক্রলিং করে রুস্তম সেকশনের সামছুল আলম ও রঞ্জু সেকশনের জুবেল গ্রেনেড নিয়ে শত্রু সেনাদের বাংকারের কাছে গিয়ে পরপর ১০ টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে বাংকারের উপর।

হানাদাররা ঐ সময় কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মুক্তিযোদ্ধারা ডিনামাইট দিয়ে ব্রীজটির এক অংশকে ধ্বংস করে দেয়। ঐ আক্রমণ অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ওয়াসিকার মোঃ ইকবাল মাজু, ছোট নুরু, মাহমুদুল হক শাহজাদা, কামু, বন্দে আলী, হামিদ, নাজিম, আলিম, মহসীন, বজলুর, সহিদুল, ঠান্ডু, ফজলু প্রমুখ। মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে যান গলনার চর ও কালাসোনার চরে। পরদিন ফুলছড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতা গজারিয়া ইউনিয়নের আব্দুল মেম্বারকে হানাদার বাহিনীর দোসররা হত্যা করে।

২। হরিপুর অপারেশনঃ ২৯ মে কাজিউল ইসলাম নৌকা যাত্রীদের কাছে জানতে পারেন যে, সুন্দরগঞ্জ কালীবাজারে হানাদার বাহিনী কয়েকজন রাজাকার নিয়ে অবস্থান করছে। কোম্পানীর কমান্ডার বি এস এফ এর সাথে যোগাযোগ করলে ৬ জুন বি এস এফ জানায় রাতে কালিরবাজার অপারেশন করতে হবে। কারণ তারা জানতে পারে যে সেখানে থেকে গুদামজাত পাট পরদিন হানাদার বাহিনী শান্তি কমিটির মাধ্যমে স্থানান্তর করবে। সেই অনুযায়ী ও পুর্বপ্রস্তুতির ভিত্তিতে সুবেদার আলতাফের নেতৃত্বে কালিবাজার ও হরিপুর অপারেশন পরিচালিত হয়। ২৮ জন মুক্তিযোদ্ধা দ্বারা পরিচালিত অপারেশনে শান্তি কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও তার দুজন সশস্ত্র রাজাকার গ্রেফতার হয় এবং দালাল রাজাকারদের লুন্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়। অপারেশন শেষে ফেরার পথে নৌকাগুলো বৃহ্মপুত্র-এর পশ্চিম তীর থেকে প্রায় ৩শ গজ দুরে যেতে না যেতেই হানাদার বাহিনী নদীর তীর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর মেশিনগানের গুলি ছোড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা নৌকা থেকে গুলি চালায়। এতে অবশ্য কোন পক্ষেরই তেমন কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

৩। কোদালকাটির যুদ্ধঃ ১৮ আগষ্ট ভোর না হতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অন্যতম যুদ্ধ কোদালকাটির যুদ্ধ শুরু হয়। হানাদার বাহিনী নৌ, স্থল ও আকাশ পথে একযোগে আক্রমণ করে। অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হানাদার বাহিনীর ত্রিমুখী বর্বোরচিত হামলা প্রতিরোধ হতে থাকে জেড ফোর্স অধিনায়ক মেজর জিয়ার সার্বিক নেতৃত্বে। সুবেদার আলতাফের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ৩'' মটারটি এক পর্যায়ে বিকল হয়ে যায়। সুবেদার আলতাফ উম্মাদের মত ছুটাছুটি করতে থাকেন। মুখোমুখী যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধরত রাইফেল, ষ্টেশন ও এল এমজিধারী বীর যোদ্ধাদের যুদ্ধে কভারিং ফায়ার সম্ভব হচ্ছিল না। এদিকে হানাদার বাহিনীর গানবোট থেকে শেলিং, এয়ার এ্যাটাক ও ভারী অস্ত্র সহ মেশিনগানের গুলির গগনবিদারী শব্দে মানকার চরাঞ্চল যেমনি কাঁপতে থাকে তেমনি গুলিতে গাছ-পালা, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হতে থাকে। ভোর রাত থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত হানাদার বাহিনীর ত্রিমুখী হামলায় গুলি বর্ষণ এক মুহুর্তের জন্যও বন্ধ হয়নি। ২ এম এফ কোম্পানী সম্মুখভাগের (পশ্চিমমুখী) ডিফেন্স উইথড্র করতে তখন বাধ্য হয়েছেন এবং ফাস্ট বেঙ্গালের পশ্চিমুখী একটা অংশ উইথড্র করেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা আগের দিনের প্রতিশ্রুত সরবরাহ পায়নি এবং বি এস এফ এর কভারিং ফায়ার হয়নি। ইতিমধ্যে মজিদ মুকুলের নেতৃত্বাধীন অংশের পশ্চিম পার্শ্বের বাংকারগুলো ঘেরাও হয়েছে। এটি এম খালেদ দুলু ও শওকত আলী ঘেরাও থেকে আখক্ষেতে সুযোগ বুঝে আত্মগোপন করেন। কিন্তু বাদিয়াখালীর বীরযোদ্ধা আলতাফ ও আঃ সামাদ রক্ষা পান না। দুজনকেই বাংকারের মধ্যেই হানাদাররা খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে। দুই বীর সহযোদ্ধা শহীদ হন। তাঁদের চিৎকার শুনে পাশের বাংকার থেকে বেরিয়ে দেওয়ানগঞ্জের বীরযোদ্ধা নজরুল পাশের বাংকারে অবস্থানরত মজিদ মুকুলকে অনুরোধ করে ইউথড্র করতে। কিন্তু শহীদ সামাদ ও আলতাফের করুণ চিৎকারে শুনে তিনি তার দলবল নিয়ে হটে যেতে পারেনি। নজরুল আখ খেতে ঢুকতেই পদব্রজে সারিবদ্ধভাবে আগত হানাদারদের দুজনে ইয়া আলী বলে মজিদ মুকুলের বাংকার চার্জ করে। মজিদ মুকুল বাংকারের এক পাশে অবস্থান নিয়ে গ্রেনেড ব্রাষ্ট করেন। সর্ববামের ডিফেন্স থেকে হাবিলদার মকবুল মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করেন মজিদ মুকুলের বাংকারে চার্জকারী হানাদারদের উপর। বীর সহযোদ্ধা মকবুলের মেশিনগানের গুলিতে লুটিয়ে পড়ে হানাদার শত্রুসেনারা। এসময় পিছনের আখ খেত থেকে দুলু বার বার অনুরোধ করছিলেন মজিদ মুকুলকে উইথড্র করতে। তিনি তাকে পিছন সারি মজিদ মুকুলের বাংকার অতিক্রমকালে ২ এম এফ কোম্পানীর উত্তর পশ্চিমমুখী ডিফেন্সের সাহসী বীর বাঙ্গালী সৈনিক বরিশালের কাশেম তার হাতে থাকা এল এম জি থেকে ব্রাশ ফায়ার করলে বেশ ক'জন শত্রু সেনা নিহত হয়। একই সময়ে হানাদারদের দুর পাল্লার কামানের শেলিং এ ফাষ্ট বেঙ্গালের বীর সহযোদ্ধা মকবুল আহত হন। তিনি তার মেশিনগান নিয়ে পুরো সেকশন উইথড্র করেন। অবশেষে মজিদ মুকুল উইথড্র করে আখ ও কাশবন পেরিয়ে নদীর পাড়ে অবস্থান নেন। সেখানে সহযোদ্ধা নজরুল ও দুলু অপেক্ষা করছিল। অপরদিকে উইথড্র করে যাওয়া সহযোদ্ধারা সুবেদার আলতাফের কাছে জানতে চান কেন কভারিং ফায়ার দেয়া হলো না? সহযোদ্ধা কমান্ডার সুবেদার আলতাফ জেড ফোর্স অধিনায়ককে ক্ষয় ক্ষতির বর্ণনা দিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ক্ষোভে দুঃখে তার পিস্তল উচিয়ে গুলি করতে উদ্যত হন। মেজর জিয়া পিস্তলটি ধরে শান্ত হবার

আহবান জানিয়ে বলেন, ''সহযোদ্ধা আলতাফ জেড ফোর্সকে সিলেট সেক্টরে যদি প্রেরণ না করা হত এবং সবাই পুর্বাপর অবস্থানে থাকতো তাহলে আমরা আরো সফল হতে পারতাম।কিন্তু বেশীর ভাগ বাহিনী ক্লোজ করায় ও ভারতীয় বি,এস, এফ প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার ফলে ঐ দিনের যুদ্ধে আশানুরূপ সাফল্য আসেনি। সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে আসছে। হানাদার বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির ফিরিস্তি তখনও পুরো জানা যায়নি। তবে গুলি বন্ধ হয়েছে। গানবোট থেকে মাঝে মাঝে মেশিনগানের গুলি ছুড়ছে আর দু'একটা করে শেলিং করছে। এরই মধ্যে বীরযোদ্ধা এবি সিদ্দিক সুফী খবর পৌঁছায় যে আমাদের মর্টারটি বিকল হওয়ার আগেই তাদের মর্টার বিকল হয়েছে। এছাড়া পাশের সেকশন থেকে নায়েক মজিদ রকেট লাঞ্চার দিয়ে শেলিং করে শত্রুসেনাদের একটা গান বোট ও একটা লঞ্চের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছেন। আর তিনি সহ বীর সহযোদ্ধা আনোয়ারুল কাদির ফুলমিয়া, রঞ্জু, আলমগীর, শরিফুল ইসলাম বাবলু, ডাঃ মনছুর এবং হাবিলদার মনছুর, নায়েক মফিজ উল্লাহ ও নয়েক আবু তাহেরের কভারিং ফায়ারে নায়েক রেজাউল তার সেকশন নিয়ে উইথড্র করতে পেরেছিলেন। এদিকে বীর সেনা বিক্রমপুরের আবুল কাশেমের নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন, হান্নান, বাবলু, রেজা নীর পূর্বপাড় থেকে সবার অজান্তে শুধুমাত্র সুবেদার আলতাফের পরামর্শে ছোট নৌকা নিয়ে পশ্চিম পাড়ে গিয়ে মজিদ মুকুল, দুলু ও নজরুলকে পার করে নিয়ে আসে। শুধু দুই সহযোদ্ধা শাহাদত বরণ করেন। জেড ফোর্স তাদের ডিফেন্স ইউথড্র করলে, হানাদার বাহিনী তাদের সহযোদ্ধা হানাদারদের মরদেহ দেখে কোদালকাটি চরের বাসিন্দা যে দু'চারজন মানুষ ছিলেন তাদের হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ভ্যাত কোদালকাটির যুদ্ধে ৩৫০ জন পাকিস্তানী হানাদার সৈন্য নিহত হয়। জেড ফোর্সের ২ এম এফ কোং হানাদার বাহিনীর ৩টা এলএমজি স্টেনগান ও ৬টা চাইনিজ রাইফেল এবং প্রচুর গোলাবারুদ ও হেলমেট দখল করতে সক্ষম হয়। ১৮ তারিখের ত্রিমুখী আক্রমণের পূর্ববর্তী ৬দিন হানাদারদের সাথে গুলি বিনিময় হয়েছিল। এক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধে জেড ফোর্সের ২ এম এফ কোম্পানীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

জেড ফোর্স অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন পরিচালিত কোদালকাটির যুদ্ধে সুবেদার আলতাফের নেতৃত্বাধীন ২ এম এফ কোং ও লেঃ আসাদের নেতৃত্বাধীন ফাষ্ট বেঙ্গলের একটা কোম্পানীর বীর যোদ্ধাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাক হানাদার বাহিনী বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল হারিয়ে লঞ্চযোগে চিমারিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

৪। রসুলপুর স্লুইস গেট আক্রমণঃ তারপর রসুলপুর স্লুইস গেটে অবস্থানকারী পাক সেনাদের উপর আক্রমনের পালা। কালাসোনার চরে ইউপি সদস্য মকসুদ আলী ও রহিম উদ্দিন সরকারের সহায়তায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের কোম্পানী কমান্ডার এম এন নবী লালু ১৫ অক্টোবর রাতে খবর পান স্লুইচ গেটের হানাদার পাক সেনাদের বেশ কজন গাইবান্ধায় যাওয়ায় শত্রুদের সংখ্যা কম। তিনি প্লাটুন কমান্ডারদের সাথে পরামর্শকমে ত্বড়িত স্লুইচ গেটে আক্রমণে সিদ্ধান্ত নেন। তখন কালাসোনার চরে সুন্দরগঞ্জ ও দারিয়াপুর ব্রীজ অপারেশনের জন্য রঞ্জু কোম্পানী এবং গাইবান্ধাকে একটা পকেটে পরিণত করার পরিকল্পনার আওতায় সাইফুল আলম সাজার কোম্পানী ও খায়রুল আলম কোম্পানী অবস্থান নিয়েছিলো। পাশের চরেই ছিল রোস্তম কোম্পানী। পিছনে মোল্লার চরে পালোয়ান কোম্পানী ও মতি মিয়াদের পরিচালিত প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের বীর মুক্তিযোদ্ধারা। লালু কোম্পানীর পরিকল্পনার আওতায় সাইফুর আরম সাজার সাজা কোম্পানী ও খায়রুল আরম কোম্পানী অবস্থান নিয়েছিলো। লালু কোম্পানীর পরিকল্পনা মতে এক্সপ্লোসিভ গ্রুপ হিসেবে সুজা কোম্পানীর টোয়াইসি আলমনির নেতৃত্বে একটি প্লাটুনকে স্লুইচ গেট বিধ্বস্তকরণ, লালু কোম্পানীর দুলাল কাদেরী ও আঃ কাইয়ুম টিপুর নেতৃত্বাধীন প্লাটুনকে জমিদার বাড়িতে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা, মোজাম্মেল হক মন্ডলের নেতৃত্বাধীন প্লাটুনকে কামারজানী থেকে হানাদার সৈন্যরা না আসতে পারে তার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও আব্দুল বাসেত সরকারের নেতৃত্বে গ্রেনেড নিয়ে সজ্জিত সুইসাইড গ্রুপ রে, সাদেকুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এক্সপ্লোসিভ গ্রুপ নিয়ে সাহসী বীর যোদ্ধা এম এন নবী লালু ঐ রাতেই স্লুইচ গেটে পৌঁছেন। বল্লমঝাড়ের সামছুল, দুদু, আঃ সাত্তার, বজলার ও সোবহান এবং আঃ কুদ্দুস ও ফুলছড়ির লুৎফরকে নিয়ে বাসেতের নেতৃত্বাধীন সুইসাইড টিম ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক সেনাদের উপর। হানাদার বাহিনীকে রক্ষায় কামারজানি থেকে পাক সেনারা এগিয়ে আসে। তারা মোজাম্মেল হকের প্লাটুনের যোদ্ধাদের গুলির রেঞ্জের আওতায় এলেই মুক্তিযোদ্ধারা গুলিবর্ষণ শুরু করেন। কোম্পানী কমান্ডারের নির্দেশে লুৎফর রহমান এক্সপ্লোসিভ গ্রুপকে স্লুইচ গেট বিধ্বস্ত করার নির্দেশ দেন। আরমনির নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেকুর, আঃ বাকী, জলিল, মোজাফ্ফর আদেল ও লুৎফর ব্রীজটির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেন। লালু কোম্পানীর বীর যোদ্ধারা ২ ঘণ্টাকাল গুলি বিনিময় করেন। সুইসাইড টিমসহ মুক্তিযোদ্ধারা ৭জন পাকিস্তানী মুজাহিদকে গ্রেফতার করতে ও ৩জন পাক সেনাকে খতম করতে সক্ষম হন। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা ৪টি এলএমজি দখল করে এবং হানাদার বাহিনী পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়।

৫। নান্দিনার যুদ্ধঃ সাজা কোম্পানী ও খায়রুল আলম কোম্পানীর সহায়তায় ১৭ অক্টোবর আমিনুল ইসলাম সুজার নেতৃত্বাধীন বাহিনী সাদুল্যাপুর থানা আক্রমণ করে সফল হয়ে ল্যান্ডিং ঘাটিতে ফিরে যান। সাজা কোম্পানীর কমান্ডার

সাইফুল আলম সাজা ও তার সেকেন্ড ইন কমান্ড ফজলুর রহমান রাজা নান্দিনা কমান্ডার ফজলুর রহমান রাজা নান্দিনা বিলে অবস্থিত একটি বাড়িতে কোম্পানী হেড কোয়ার্টার হিসেবে অবস্থান নেন। তার নেতৃত্বাধীন প্লাটুনগুলো দুটি গ্রামে অবস্থান নেয়। সাজা কোম্পানী রতনপুর হয়ে নান্দিনা হয়ে নান্দিনা শহর আসাকালে ত্রিমোহনী রেল স্টেশনের কাছে রেল লাইনে মাইন পুঁতে রাখে। কোম্পানী কমান্ডার ও সেকেন্ড ইন কমান্ড এর নেতৃত্বাধীন হেড কোয়ার্টার গ্রুপ থেকে বিভক্ত হয়ে পড়ে দুটি প্লাটুনে। প্লাটুন দুটি শত্রু সেনাদের আওতার মধ্রে অবস্থান নেয়। আত্মরক্ষায় মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে থাকেন। হানাদাররাও কাছাকাছি পৌঁছতে থাকে। সেই সময় এলএমজি সজ্জিত সাহসী মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম হিরু ও বোয়ালীর আব্দুর রহমান (ওরফে কানা রহমান) শত্রু সেনাদের প্রতি এলএমজির গুলি বর্ষণ শুরু করেন।

দর্জি মাস্টার বীর সৈনিক আব্দুল আউয়াল মুক্তিযোদ্ধাদের হানাদার বাহিনী ঘেরাও থেকে রক্ষার পথ দৃষ্টিতে এলএমজি'র গুলি বর্ষণ করেন। কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা তাঁর ফায়ারিং এর সুvাগে একত্রিত হয়ে লক্ষ্মীপুরে এক পাট গুদামে অবস্থান নেন। হিরু ও রহমান এর গুলিবর্ষণের সুযোগে ক'জন ঘেরাও থেকে বেরিয়ে ফিরতে পারলেও বিমানবাহিনীর অকুতভয় সৈনিক ভোলা জেলার ওমর ফারুক ও মোস্তফার ভাই বোয়ালীর নবীর হোসেন, ফলিয়ার হামিদুর রহমান. লক্ষ্মীপুরের আবেদ আলী ও গাইবান্ধা পশ্চিমপাড়ার আসাদুজ্জামান নবাব শহীদ হন্ এই বীর শহীদদের হত্যা করে হানাদার সৈন্যরা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে বীর শহীদদের লাশগুলো স্থানীয় জনগণ তড়িঘড়ি করে গাইবান্ধা-পলাশবাড়ি সড়ক পাশে দাফন করেন এবং শহীদ ওমর ফারুকসহ অপর তিন শহীদের লাশ দাফন করেন গাইবান্ধা সাদুল্যাপুর সড়কের পাশে।

৬। উড়িয়ার চরের সফল অভিযানঃ অত্যাচার, নির্যাতন, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, জানাদার পাক বাহিনী ও তার দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-শামসদের নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দলবেধে রাজাকাররা যখন কালাসোনার পশ্চিমপারের গ্রামে এসে লুটপাট করছিল তখন মুক্তিসেনারা মুহূর্তে গ্রাম ঘিরে ফেলে। পরিস্থিতি অাঁচ করতে পেরে রাজাকাররা পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অত্যাচারী নরঘাতক বর্বরদের দোসররা ধরা পড়ে যায়। ঐ দিন সন্ধ্যায় বারজন রাজাকার ধরা পড়ে এবং রাইফেল উদ্ধার করা হয় ষোলটি। দু'জন রাজাকার পালিয়ে যায় আর দুজনকে গ্রামের জনগণ কুপিয়ে হত্যা করে। রাজাকারদের যখন মুক্ত এলাকায় আনা হয় তখন জনগণের মাঝে এক মহা-আনন্দ উৎসব। কিন্তু দেখা গেল দুপুর থেকে রতনপুর উড়িয়া গ্রামে পাক সেনাদের রণসজে অতি সন্তর্পণে ঘোরাঘুরি আর গ্রামবাসী নেই বললেই চলে। পরদিন সকাল থেকেই পৈশাচিক তান্ডবে হানাদার বাহিন মেতে উঠলো। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। তারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন, বিভৎস এক নারকীয় দৃশ্য। ভয়াল এক নৌকা দুটি ভাটি থেকে উজানে যাচ্ছে। প্রথম নেকায় রাজাকার রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনের অংশের ছইয়ের বাইরে আরো ১০/১৫ জন পাক সেনা বসে। মাহবুব এলাহী সহযোদ্ধাদের নিয়ে সকাল থেকেই প্রহর গুণছিল। বিশেষ মুহূর্তটি এসে গেছে। সংকেত পাওয়া মাত্রই মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র নিয়ে নৌকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রথম গুলিতেই ছইয়ে বসা নরঘাতকটি ওর হাতের হাতিয়অরসহ পানিতে পড়ে গেল। পাল্টা আক্রমণের খুব সুযোগ ছিল না। তবু পাকসেনারা গুলি বিনিময় করলো শেষ রক্ষা পাবার আশায়। রাজাকাররা মুহূর্তের মধ্যে নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এরই মধ্যে নারী কণ্ঠের আর্তনাদ সকলকে হতচকিত করে দেয়। সত্য সত্যই দুই যুবতী নারী হানাদার পশুদের লোলুপ আক্রমণের শিকারে বিবস্ত্র হয়ে আছে। জীবন সম্ভ্রম বাঁচাবার কি নিদারুণ আর্তি। এবার ওরাও নদীতে ঝাঁপ দিল। যমুনার তীরে বেড়ে ওঠা গ্রামের যুবতী হানাদার পশুদের লোলুপ আক্রমণের শিকারে বিবস্ত্র হয়ে আছে। জীবন সম্ভ্রম বাঁচাবার কি নিদারুণ আর্তি! এবার ওরাও নদীতে ঝাঁপ দিল। যমুনার তীরে বেড়ে ওঠা গ্রামের যুবতীর মনে মহামুক্তির আস্বাদ লাভের ব্যগ্রতা। যদি নদীবক্ষে নিমগ্ন হয়ে মৃত্যু হয়- তা পশুদের নির্দয় পাশবিক লালসার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার চেয়ে অনেক ভালো। নরপশুদের মধ্যে যারা মরলো না বা পালিয়ে যেতে পারেনি তাদের বন্দি করা হয়। নৌকার অভ্যন্তরে ছিল লুটপাট করা নানা ধরণের খাবার এবং অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ এগুলি মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

৭। কালাসোনা থেকে ফজলুপুরঃ নভেম্বর মাসের শরুতেই শীতের আগমন ধ্বনিত হয়। তখন স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সংগ্রামে নিয়োহিত বীর সেনানীরা খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধের অভাবে নিদারুণ সংকটের মুখোমুখী। নদীর পারে সেই কালাসোনা চরের অসীম সাহসী বীর যোদ্ধারা শীতের প্রকোপ ঠকঠক করে কাঁপত কাঁপতে দিবারাত্র বিশেষ করে কাকভোরে শত্রুসেনাদের ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ করতে এবং বর্বরদের প্রতিহত করতে ব্যস্ত থাকত। এক ভোরে খবর এলো হানাদারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ থেকে কালাসোনার দিকে এগিয়ে আসছে। এমন ধরণের আক্রমণ যে হতে পারে সেটা মুক্তিযোদ্ধাদের অজানা ছিল না। একটার পর একটা অভিযানের মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তখন যুদ্ধে পারদর্শী হয়ে উঠছে। সামান্য প্রশিক্ষণ পেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মুক্তিসেনাদের দূরদশী, নিখুঁত প্লান তৈরী ও তা কার্যকর করার পদ্ধতি দেখে অবাক হতে হতো। মাহবুব এলাহী রঞ্জু তাঁর কোম্পানীর সহযোদ্ধাদের নিয়ে পশ্চিম পারের নদী পার হয়ে ধানের ক্ষেতে অবস্থান

নির। ভোর বেলাতেই তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে গেল। সূর্য উফলো, সকাল বেলা রণাঙ্গণ আরও তেতে উঠলো। মুক্তিযোদ্ধাদের বজ্রশপথ, অবস্থান ছাড়বো না। আধাপাকা ধানের ক্ষেতের আগালে তারা অবস্থান নিয়েছে, স্বভাবতই বর্বরদের অবস্থান ঐ মুহূর্তে ভাল ছিল। বীর সেনানী ফলুর ঘাড়ে হঠাৎ একটি গুলি লাগলো। ও কাতরাচ্ছে, ছটফট করছে। এমন সময় ঝড়ের বেগে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে মান্নান ওর কাছে চলে এলো। এতে ওর যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয়েছিল। বৃষ্টির মত গুলি তখন ওদের দিকে আসছে। নিশ্চিত মৃত্যু ভেবে পাশেই একটু নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেবার আশায় মান্নান ওকে পিঠে করে নিয়ে লাফ দিল। নিয়তি এতই বিরূপ যে পুনরায় ফজলুর পিঠে, কোমরে গুলি লাগলো। মানসিক দৃঢ়তার বলে বলীয়ান হলেই জীবনীশক্তি ধরে রাখা যায় না। শহীদ হলো ফজলু। রণাঙ্গণে লাশ হয়ে পড়ে থাকলো। চারদিক নিস্তব্ধ, নিথর। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মুক্তিসেনারা শোকে মুহ্যমান। ফজলুর লাশ নিয়ে কালাসোনার চরে ফিরলো ওরা। শহীদদের মর্যাদায় ফজলুর দাফন-কাফন সম্পন্ন হলো। উপস্থিত জনতা প্রস্তাব দিল কালাসোনা ইউনিয়নের নাম আজ থেকে ফজলুপুর ইউনিয়ন হবে। সেই থেকে এই এলাকাটি শহদিকে বুকে ধারণ করে ফজলুপুর নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

সাঘাটা আক্রমণঃ পাক সেনাদের নিধন করার আরেকটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের স্থান ফুলছড়ি রেলওয়ে স্টীমার ঘাট ও বোনারপাড়া জংশনের মাঝে ভরতখালী রেলওয়ে স্টেশন। ভরতখালীর কাছে এই দুঃসাহসিক অভিযানটি পরিচালিত হয় কোম্পানী কমান্ডার রোস্তম আলীর নেতৃত্বে। এই যুদ্ধটি এত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল যে, এর প্রসিদ্ধি ঐ অঞ্চলে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের এই সময়ে গোটা এলাকার জনজীবনের উপর নেমে এসেছে বিভীষিকা। অত্যাচার, উৎপীড়ন আর বর্বরতা তখন সবরকমের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। জনগণ সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার অদম্য বাসনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক সমর্থন এবং সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। রোস্তম পেয়েছিলেন অভিযানের দায়িত্ব। নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদ অনুসারে রেলপথে ফাঁদ পাতা হয়। বলাবাহুল্য হানাদার বাহিনী মুক্তিসেনাদের আক্রমণের ভয়ে রেফথের দুই দিকের আধা মাইল, কোথাও এক মাইল পর্যন্ত এলাকায় গাছপালা, জনবসতি, বাড়িঘর সম্পূর্ণ নির্মূল করে ফেলত, যাতে করে মুক্তিবাহিনী ওৎ পেতে আক্রমণ করতে না পারে। ইতিহাসের শিক্ষা, স্বাধীনতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনগোষ্ঠীর নিকট কোন বাঁধাই বাঁধা নয়। ইলেকট্রিক ডিটোনেটর মাইন বসিয়ে ছেলেরা প্রহর গুণতে লাগলো। অবশেষে সেই মুহূর্তটি এসে গেল। মাইন বিস্ফোরণের পর উভয় পক্ষের সারাদিনব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হয। যুদ্ধে লেঃ কর্ণেল রহমত উল্লাহ খান, মেজর শেখ খানসহ প্রায় ১৫/২০ জন পাক সেনা নিহত হয়।

৯। সন্যাসদহ রেল ব্রীজের যুদ্ধঃ গাইবান্ধা-বোনারপাড়া রেলপথে আলাই নদীর উপর সন্নাসদহ রেলব্রীজ (পদুমশহর ইউনিয়ন) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। এই ব্রীজের নিরাপত্তার দায়িত্বে ১০জন রাজাকার নিযোজিত ছিল। তারা ব্রীজের আশে পাশে জনগণকে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করতো। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে মজিবর রহমান দুদু ও তাছলিম হাওয়ালদারের নেতৃত্বাধীন একটি মুক্তিযোদ্ধার ছোট গ্রুপ এই ব্রীজ আক্রমণ করে। সেখানে দায়িত্বপালনরত রাজাকার বাহিনী অত্র ফেলে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে। ৬/ টি রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয। এলাকার আশান্বিত হয় ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।

১০। ভাঙ্গামোড়ের এ্যামবুশঃ গাইবান্ধা-ফুলছড়ি সড়কের ভাঙ্গামোড় নামক স্থানে এই এ্যামবুশ পাতা হয়েছিল। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হানাদার বাহিনীর কনভয় যাতায়াত করতো। শব-ই-মেরাজের ৩দিন আগে রোস্তম আলী খন্দকারের কোম্পানীতে খবর আসে যে, শব-ই-মেরাজের দিন সকাল ১০টার দিকে পা বাহিনীর একজন মেজরসহ একটি কনভয় (গাড়ির বহর) গাইবান্ধা থেকে ফুলছড়ি যাবে। এই বহরে গোলাবারুদ ও অন্যান্য রসদপত্র আসবে। সেই মোতাবেক আগের রাত্রিতে বদি সরকারের বাড়িতে হাইড আউট করা হয়। দলের সবাই রোজা রাখার উদ্দেশ্যে সেহরী খেয়ে এমবুশস্কলে আসে। পূর্বেই রেকি করে জায়গা নির্ধারণ করা ছিল। এমবুশ দল ৪ ভাগে বিভক্ত হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পজিশন নেয় এবং শত্রুর জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে। বেলা ১০টার কয়েক মিনিট আগে গাড়ির আওয়াজে সবাই একত্রিত হয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকে। পরে ৩টি গাড়ি দেখা যায়। গাড়ি এমবুশ স্থলের দিকে আসতে থাকলে মুক্তিযোদ্ধাদেরও উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। গাড়ির বহর এমবুশ এলাকায় আসার সাথে সাথে দলপতি রোস্তম আলী মুক্তিযোদ্ধাদের ফায়ার ওপেন করার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে রাস্তার দুই ধার থেকে ৩টি দলের তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়। হানাদারা দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গুলি ছুড়তে শুরু করে। কিছুক্ষণ গোলাগুলির পর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমণে টিকতে না পেরে তারা গাড়িতে উঠে পালাতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা দৌড়ে রাস্তায় ওঠে অসে আক্রমণ করতে করতে। আবুল হাসানের মর্টারটি অকেজো হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পায়যে, হানাদার বাহিনীর মেজর সহ ৩জন নিহত হয়েছে। যাওয়ার সময় হানাদার বাহিনী লাশ নিয়ে যায। ২টি চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল হস্তগত হয। এটি এই এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে প্রথম আক্রমণ। মর্টারটি যদি সেদিন বিকল না হতো তবে হানাদার বাহিনীর আরও বেশী ক্ষতি হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের সামান্যতম ক্ষতিও সেদিন হয়নি।

১১। সাঘাটা থানায় প্রথম আক্রমণঃ সাঘাটা থানার কামালেরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ডিফেন্স থেকে এই রেইড পরিচালনা করা হয়েছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধা রোস্তম আলির নেতৃত্বে ২২ জনের মুক্তিযোদ্ধার দল ৩টি উপদলে বিভক্ত হয়ে সাঘাটা থানার এই রেইড পরিচালনা করে। ১০টার দিকে সাঘাটা থানার উপর ৩দিক থেকে আক্রমণ করা হয়। গুলির জবাবে থানা পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গুলি ছোড়ে। কিছুক্ষণ পর মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে তারা টিকতে না পেরে থানা পুকুরে ডুব দিয়ে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা থানার মালখানা ভেঙ্গে শতাধিক রাইফেল, বন্দুক ও বিপুল পরিমাণ গুলি নিয়ে হাইড আউটে ফিরে যায়। এই সফল অপারেশনের খবর শুনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তুরা রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার সানত সিং বাবাজী মুক্তিযোদ্ধাদের এ সফল অপারেশনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের আরও পুরস্কৃত করেছিলেন তদানিন্তন এমপি অধ্যঅপক আবু সাইদ, কুড়িগ্রামের তদানিন্তন এমপিও, মরহুম অব্দুল্যা সোহরাওয়ার্দী, গাইবান্ধার এমপিও মরহুম ডাঃ মফিজার রহমান।

১২। কাগড়াগাড়ী ব্রীজের যুদ্ধঃ ভরতখালী স্টেশন সংলগ্ন এই ব্রীজের এক পাশে রেল গাড়ি ও অপর পার্শ্বে লোকজন চলাচল করতো। ভরতখালী বাজারে জুট বোর্ডের গুদাম ছিল। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান পণ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সোনালী অাঁশ পাট। সরকারের অর্থনীতি দুর্বল করার মানসে ঐ পাট গুদামে অগ্নিসংযোগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রোস্তম আলী খন্দকারের নেতৃত্বে দলকে ৩টি উপদলে বিভক্ত করে একটি দলকে ব্রীজে, ১টি দলকে ভরতখালী হাইস্কুলের পিছনে ও অপর ১টি দলকে পাটগুদামে অগ্নিসংযোগের জন্য নিয়োজিত করা হয়। পাট গুদামোর অগ্নিসংযোগের পর ব্রীজে নিয়োজিত রেঞ্জার ও রাজাকারা পাট গুদামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাদেরকে বাঁধা দেয়া হয়। সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। ফুলছড়ি ঘাট সদর হতে অগ্রসরমান হানাদার বাহিনীও মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে বাঁধাগ্রস্ত হয়। পাটগুদাম ধ্বংসের পর মুক্তিযোদ্ধারা নান্দুরা গ্রামেরহাইয আউটে ফেরত যায়। এই অভিযানে গুদামে রফতানীর জন্য রক্ষিত ৬/৭ শত বেল পাট ভস্মিভূত হয়।

১৩। ত্রিমোহিনী ঘাটের যুদ্ধঃ গাইবান্ধা জেলায় হানাদার বাহিনীর সাথে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২৪ অক্টোবর সাঘাটা থানা ত্রিমোহিনী ঘাটে। বাংলাদেশের অন্যতম অবাঙালি অধ্যুষিত সাঘাটা থানা সদর বোনারপাড়ার উপর সর্বাত্মক আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয় ২৬ শে অক্টোবরে। পরিকল্পনার প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমে অবস্থান নেয়া হয় গোবিন্দগঞ্জ থানার হরিরামপুর ইউনিয়নের তালুক সোনাউল্লা গ্রামে। সেখানে অবস্থান করে মুক্তিযোদ্ধারা পরবর্তীতে হানাদার হেড কোয়ার্টার পশ্চিম রাঘবপুরের মমতা মেম্বারের বাড়িতে হাইড আউট করে। পরিকল্পনা ছিল যে তিন স্থানে তিনদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বোনারপাড়ার পূর্বের তেনিয়ার গ্রামে নিয়ে আসা হবে এবং ২৬ মার্চ রাত্রিতে তিন জায়গা থেকে অগ্রসর হয়ে বোনাপাড়ার উপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই ২৪ অক্টোবর হানাদার বাহিনী তিনদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তালুক সোনাডাঙ্গার হাইড আউটের উপর আক্রমণ করে বসে। সেখানে বেলা ১১টা পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলে। ১১টা পর্যন্ত হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের দলের অসীম সাহসী আলম ও বজলু জীবিত পাঞ্জাবী সৈন্য ধরার মাননে অবস্থান পরিবর্তন করে নদী পার হয়ে ত্রিমোহিনী ঘাটে আসে। সেখানে হানাদার বাহিনীকে না দেখে একটু বিশ্রাম নিতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই অবস্থানরত দলের উপর হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি শেষ হয়ে যায়। সেখানে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে হামিদুর রহমান মধু ও শহদিুল্লাহ হানাদার বাহিনীর হাতে আর্তসমর্পণের চেয়ে আত্মহত্যা করা শ্রেয় বিবেচনা করে নিজেদের অস্ত্রের শেষ সঞ্চিত গুলি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ২৭জন নিহত ও বিপুল সংখ্যক আহত হয। ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

তিস্তামুখঘাটে জাহাজ আক্রমণঃ হানাদার বাহিনীর ২৭ ব্রিগেড রংপুরকে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করে রৌমারী মুক্তাঞ্চল দখলে নেয়া তথা সীমান্ত এলাকা সীল করার উদ্দেশ্যে ৩টি জাহাজ অস্ত্র গোলাবারুদ বোঝাই হয়ে আসে। তিস্তামুখ ঘাট থেকে জাহাজ খালাস করে রেলগাড়িতে রংপুর সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারে।

মুক্তিযোদ্ধারা সাথে সাথে সেক্টর কমান্ডার হামিদুল্লাহ খানকে ঘটনাটি অবহিত হরে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গোহাটীর আঞ্চলিক নৌবাহিনী দপতএরর সাথে যোগাযোগ করেন। গৌহাটীর নৌঘাট থেকে তিন জন নৌকমান্ডো মুক্তিযোদ্ধাকে উক্ত

অপারেশনের জন্য পাঠানো হয়। তারা তিস্তামুখঘাটে কর্মরত লোকের মাধ্যমে সমগ্র তিস্তামুখঘাট ও যুদ্ধাস্ত্রবাহী জাহাজ তিনটি রেড করে। অপারেশনের রাতে গলনার চরের সাবেদ মেজরের বাড়ির হাইড আউট থেকে ৩টি নৌকা যোগে নৌকমান্ডো তিন জনকে লিমপেট মাইন ও অন্যান্য অস্ত্র সহ তিস্তামুখ ঘাটের কাছে নামিয়ে দিয়ে পজিশন নিয়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। তারা ৩জন যথারীতি জাহাজে সাঁতরিয়ে চলে যায়। তিন জাহাজের তলদেশে গিয়ে জাহাজের তলদেশ পরিস্কার করে লিমপেট মাইন স্থাপন করে। আমাবশ্যার অন্ধকার রাত ও প্রবল বৃষ্টির কারণে ব্রক্ষপুত্র খুব উত্তাল ছিল। যার দরুণ তারা সঠিকভাবে মাইন স্থাপনে সক্ষম হয়নি। ফজরের আযানের পূর্বে তিন নৌ-কমান্ডোর একজন ফজলুল হক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ফিরে আসে। সে আপারেশন স্রোতের জন্য সফল না হওয়ার খবর শুনায় এবং সাথীরা খুব সম্ভব বেঁচে নেই বলে জানায়। সে আরও জানায় যে, জাহাজের তলদেশ পিছল থাকায় মাইন লাগানোর সময় পানিতে পড়ে যায়। সেই মাইন বের করে লাগানোর উদ্যোগ নেয়ার সময় দুই নৌকমান্ডো জাহাজের ফ্যানে আটকে পড়েছে বলে আশংকা ব্যক্ত কর। তারপর সে সকালেই হাইড আউটে ফিরে আসে। এরপর গোপনে নৌকমান্ডো দু'জনের লাশ সন্ধান করা হয়। তিনিদিন পর দুজন নৌকমান্ডোর লাশ তীরে এসে চাপে। তাদের লাশ দেখতে পেয়ে হানাদার বাহিনী কাম্পে নিয়ে যায় এবং ফুলছড়ি বধ্যভূমিতে পুঁতে রাখে। সেদিনের এই অপারেশন সফল হলে অস্ত্র বোঝাই ৩টি জাহাজ সহ তিস্তামুখঘাট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হতো। বৈরী আবহাওয়া ও উজানতরঙ্গ সেদিন সফল হতে দেয়নি।

১৫। পুরাতন বাদিয়াখালী পাটগুদাম অগ্নি সংযোগঃ সাঘাটা থানার সওলা ইউনিয়নের পুরাতন ভরতখালী একটি প্রসিদ্ধ হাট। এই বন্দরে সরকারি-বেসরকারি অনেক কয়েকটি পাটগুদাম ছিল। গুদামগুলিতে প্রাচ্যের ডান্ডি নারায়ণগঞ্জের মাধ্যমে বিদেশে রফতানির জন্য বিপুল সংখ্যক বেল বাধা পাট ছিল। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান পণ্য ছিল এই পাট। তাই পাট গুদাম ধ্বংসের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র হাট এলাকায় পজিশন নেয়া হয়। মূল দল রোস্তম আলী খন্দকারের নেতৃত্বে মলোটভ ককটেল ফাটিয়ে ও পেট্রোল দিয়ে পাট গুদামগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে। পাট গুদাম সম্পূর্ণরূপে ভস্মিভূত হওয়ার পর তারা হাইড আউটে ফিরে যায়।

১৬। পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সের অফিসার আটকঃ রোস্তম আলী খন্দকারের দলের সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধারা সাঘাটা থানার কচুয়া ইউনিয়নের বুঝরি তে মুক্তিবাহিনীর তথ্য তাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর সে তার পরিচয় জানায়। পর তাকে সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টার মানকারচরে পাঠানো হয়। সেক্টর কমান্ডারের কাছে সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিল। চলমান মুক্তিযুদ্ধে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যথেষ্ঠ কাজে লেগেছিল। নতুন যোদ্ধারা ছল রফিকুল, আফজাল ও খালেক।

১৭। দেওয়ানতলা রেল ব্রীজ ধ্বংসঃ বোনাপাড়া-বগুড়া রেলপথে বাঙ্গালী নদীর উপরে দেওয়ানতরা রেলব্রজি অবস্থিত। রণকৌশলগত কারণে শিল্প শহর বগুড়ার সাথে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ এই রেলপথের ব্রীজটি ধ্বংস করলে ৭২ ব্রিগেড রংপুরের সাথে বগুড়ার যোগাযোগ তথা ঢাকার সাথে বগুড়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারলে সরকারের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে। তাই গোবিন্দগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোখলেছুর রহমান দুলুর দল ও রোস্তম আলী খন্দকারে দল যৌথভাবে এই ব্রীজটি ধ্বংস করে। যা স্বাধীনতার পর চালু করা হয়েছিল। এই ব্রীজ ধ্বংসের ফলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা, মালামাল, যাত্র পরিবহন, সেনা পরিবহন ধ্বংস ছিল।

১৮। মহিমাগঞ্জ চিনিকল ধ্বংসঃ মহিমাগঞ্জ চিনিকল এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চিনিকল। এটি ছিল একটি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই মিলটি ধ্বংস করতে পারলে পাকিস্তান সরকারের অর্থনীতি দুর্বল হবে সেই লক্ষ্যে রোস্তম আলী খন্দকারের দল অক্টোবরের শেষে এই মিলটির উপর আক্রমণ চালিয়ে চিনিকলটি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছিল। পাকিস্তান সরকার এই মিলটির ক্ষতির কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১৯। সাঘাটা থানায় দ্বিতীয় আক্রমণঃ অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে রোস্তম আরী খন্দকারের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার সাঘাটা থানা আক্রমণ করা হয়। থানার অধিকাংশ পুলিশ এই দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে, কিছু পালিয়ে যায়। বিপুল সংখ্যক রাইফেল ও গুলি হস্তগত হয়। আত্মসমর্পণকৃত পুলিদেরকে মানকার চরে সেক্টর সদর দপ্তরে পাঠানো হয়।

২০। সিংড়া রেলব্রীজ অপারেশনঃ বোনাপাড়া তিস্তামুখ রেলপথের মধ্যবর্তী স্থানে সিংড়া ব্রীজের অবস্থান (পদুম শহর ইউনিয়ন)। ২০ জন রাজাকার এই ব্রীজের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। রাজাকাররা পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণকে বিভিন্নভাবে নিপীড়ন-নির্যাতন করতো। মানুষের বাড়িতে হামলা করে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, চাল-ডাল বের করে নিয়ো অসতো। অন্যায়ভাবে মানুষকে মারধর করতো। ব্রীজ দিয়ে যাওয়া আসার পথে মানুষের টাকা পয়সা কেড়ে নিতো। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল স্থানীয় জনগণ। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের লোকজনকে ধরে আনতো। মুক্তিযোদ্ধাদের আসা যাওয়ার খবর হানাদার বাহিনীকে সরবরাহ করতো। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে এই ব্রীজের উপর রোস্তম আলী খন্দকারের দল আক্রমণ করে। সেখানে আক্রমণে টিকতে না পেরে ৩জন রাজাকার অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। বাকী ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। পাক বাহিনী পরের দিন ১৭টি লাশ বোনাপাড়া আনে এবং স্টেশন ওয়ার্ডের উত্তর পাশে দুই লাইনের কাছে তাদেরকে মাটিচাপা দিয়ে রাখে।

২১। ভাঙ্গামোড়ে পুলিশ আটকঃ রোস্তম আলীর কোম্পানীর যোদ্ধারা ভরতখালী ইউনিয়নের ভাঙ্গামোড় গ্রাম হতে দিনের বেলা ২জন সশস্ত্র পুলিশকে ধরে মানকার চর সেক্টর হেড কোয়ার্টারে হস্তান্তর করে। তারা এই এলাকায় হানাদার বাহিনীর নির্দেশে তথ্য সংগ্রহ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অভিভাবকদের ধরার জন্য এসেছিল।

২২। রাজাকার আটক ও হত্যাঃ রোস্তম আলী খন্দকারের নেতৃত্বাধীন কোম্পানীর যোদ্ধাদের সশস্ত্র তৎপরতায় সাঘাটা-ফুলছড়ি থানা এলাকার রাজাকাররা সদা তটস্থ থাকতো। বিপুল সংখ্যক রাজাকার এই দলের কাছে স্বেচ্ছায় অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছিল। অনেক ক্যাম্পের রাজাকারা হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন তথ্য পাঠাতো মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। অনেক রাজাকার কমান্ডার গোপনে খবর পাঠাতা যে মুক্তিবাহিনী আমাদের ক্যাম্পের উপর ফায়ার দিলে আমরা অস্ত্রসহ মুক্তিবাহিনী দল চলে আসবো। এই রকম দু'জন হলেন মরহুম ময়েজ উদ্দিন এবং আফসার আলী (ফুলছড়ি)। তারা তাদের দল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আসে এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযোদ্ধাদের দলের তৎপরতায় এই এলাকার খুব কম লোকই রাজাকার, আল বদর ও আলশামস বাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকার চাপ ভয়ভীতির কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছিল। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এই দলের ব্যাপক সশস্ত্র তৎপরতার ফল দালালরা ও শান্তি কমিটি তাদের তৎপরতা চালাতে পারেনি। যারা ছিল তারাও এই দলের হাতে মরা পড়েছে। তাদের মধ্রে সগুনার ময়েজ মৃধা, ফুলছড়ি খাকসার মৌলভি অন্যতম।

২৩। ফুলছড়ি থানা রেইডঃ উপর্যুপরি কয়েকটি অপারশন শেষে গলনারচরের হাইড আউটে মুক্তিযোদ্ধারা সমবেত হয়। ৩ ডিসেম্বর রাত্রিবেলা গোপন সূত্রে খবর আসে যে, ঐদিন ফুলছড়ি টিটিডিসি কমপ্লেক্সের ক্যাম্প থেকে বেশ কিছু হানাদারকে গাইবান্ধা নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদের বদলে কেউ আসেনি। এই খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্লাটুন কমান্ডার সামছুল আলমকে ৩০ সদস্যের ফাইটিং পেট্রোল নিয়ে ফুলছড়ি থানা সদরে পাঠানো হয়। এবং একই সাথে সুযোগ বুঝে ফুলছড়ি থানা রেইড করার নির্দেশও দেওয়া হয়। সামছুল আলমের দল খবরের সত্যতা যাচাই শেষে হাইড আউটে ফেরৎ আসার পথে সকাল ১০টায় ফুলছড়ি থানার উপর আক্রমণ চালায় এবং বলতে গেলে বিনা বাধায় ফুলছড়ি থানা থেকে ৩২টি রাইফেল, বন্দুক ও কয়েক বাক্স গুলি নিয়ে নিরাপদে হাইড আউটে ফেরৎ আসে। এই রেইডের ফলে দলের যোদ্ধাদের সাহস বেড়ে যায়।

২৪। ৪ ডিসেম্বর এর ফুলছড়ির যুদ্ধঃ এই দিনের যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ২৭ জন সদস্য নিহত ও বিপুল সংখ্যক আহত হয় এবং ৫জন মুক্তিযোদ্ধা বাদল, আফজাল, সোবহান, আনছার আলী ও কারেজ আলী শহীদ হন। সেদিন কোম্পানী কমান্ডার এর অনুপস্থিতিতে গৌতম চন্দ্র মোদকের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে ৬টি পাল্টুনের নেতৃত্বে ছিলেন সামছুল আলম, মহসিন, নাজিম, তছলিম, এনামুল এবং ময়েজ। যুদ্ধে নিয়োজিত ৬টি দলের সমন্বয়ে ছিলেন আব্দুল জলিল তোতা, আবু বকর সিদ্দিক ও হামিদুল হক কাদেরী।

মুক্তিযোদ্ধাদের দলের সঙ্গে হানাদার বাহিনীর প্রথম সংঘর্ষ হয় ঘাঘট রেলব্রীজে। সেই যুদ্ধ সরা ফুলছড়ি সদরে ছড়িয়ে পড়ে। পলায়নপর হানাদার বাহিনীর সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় গোবিন্দী (সাঘাটা)তে ওয়াপদা বাঁধের উপর। গোবিন্দীতেই ৫জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ৬ ডিসেম্বর দলের অসীম সাহসী যোদ্ধা বজলুর রহমান বজলু স্থানীয় জনগণের সহায়তায় গরুর গাড়িতে করে ৫টি লাশ সাঘাটা থানার তৎকালীন সগুনা ইউনিয়নের ধনরুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তেহ ৫টি কবরে সমাহিত কর। সমাহিত কতে বজলুকে সাহায্য করেছিলেন দুদু চেয়ারমান, গিয়াস সরকার ও আরও অনেকে। দেশ জনগণের সার্বিক সহায়তায় পাকা করেন ও একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। প্রতি বৎসর স্থানীয় জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে ৪ ডিসেম্বর এখানে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ স্মৃতি দিবস পালিত হয়। ধনারুহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদদের সমাধি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধারণ ও ফুলছড়ি যুদ্ধের ইতিহাস হয়ে নব প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতানায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যুগিয়ে যাবে যুগ যুগ ধরে। সগুনা ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি থাকার প্রেক্ষিতে ও স্থানীয় জনগণের দাবির স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার ১৯৮২ সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সগুনা ইউনিয়নের নামকরণ করেন মুক্তি নগর ইউনিয়ন। বাংলাদেশের স্মরণে কোন ইউনিয়নের নামকরণ করা এক বিরল দৃষ্টান্ত।

গাইবান্ধার বধ্যভূমিঃ ১৯৭১'র ১৭ এপ্রিল সকালে পাক হানাদার বাহিনী মাদারগঞ্জ ও সাদুল্যাপুর হয়ে গাইবান্ধায় প্রবেশ করে। তরা গাইবান্ধা স্টেডিয়াম (বর্তমান শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম) ওয়ারলেস কেন্দ্রটি দখল করে সেখানে ঘাঁটি করে।

এই ঘাঁটি থেকেই তরা শহর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ, নারী নির্যাতন চালাতে থাকে। তাছাড়াও তারা জেলার বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করে। তারা ক্যাম্পে অসংখ্য মানুষ ধরে এনে হত্যা করার পর মাটিতে পুঁতে রখে। বিভিন্ন রাস্তা-ঘাটের পাশেও অসংখ্য লাশ সে সময় পুঁতে রাখা হয়। তাই এই স্থানগুলো পরে বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৯৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর গঠিত গাইবান্ধা ৭১ এর বধ্যভূমি চিহ্নিতদকরণ ও সংরক্ষণ কমিটি এক জরিপ চালিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থানে ২৮টি বধ্যভূমি চিহ্নিত করে। এগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা স্টেডিয়ামের দক্ষিণ পাশে, ফুলছড়ি সদরের দক্ষিণে লে লাইনের ধারে, পলাশবাড়ি সড়ক ও জনপদ বিভাগের ডাক বাংলোতে (রেস্ট হাউজ) ও কাশিয়াবাড়ি, ঘোড়াঘাট সড়কের পাশে কিশোরগাড়ি, বৈরী হরিণামারী, গোবিন্দগঞ্জের কাটাখালি, কোচামহর, নাকাইহাট, মহিমাগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ছাপড়হাটি, সদর উপজেলার বল্লমঝাড়, সাহাপাড়া, কামারজানি, সাঘাটার দলদলিয়া, সগুনা (ধনারুহা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এর মধ্যে গাইবান্ধা স্টেডিয়ামের দক্ষিণ অংশে এবং স্টেডিয়ামের বাইরে দক্ষিণের ঘেরা দেওয়া নির্মাণাধীন বাড়িটির ভেতরে অসংখ্য মানুষ হত্যা করে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। প্রতি রাতেই এই বাড়িতে দালালদের সহায়তায় অসহায় মানুষদের ধরে এসে পাকসেনারা তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করত। বিভিন্ন বয়সী মেয়েদের এখানে ধরে এনে ধর্ষণের পর হত্যা করা হতো। ৭১ এর ৯ ডিসেম্বর পাকসেনারা গাইবান্ধা থেকে পলায়নের পর এই ক্যাম্পে মেয়েদের অসংখ্য পরিধেয় বস্ত্রাদি পাওয়া গেছে। স্টেডিয়ামের দক্ষিণ পার্শ্বেও প্রতি রাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু লোক ধরে এনে গুলি করে হত্যার পর মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। পার্শ্ববর্তী রেল লাইনের ধারেও গর্ত করে লাশ পুঁতে রাখা হতো।

অনেক ক্ষেত্রে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের দিয়েই কবর খুঁড়ে নেয়া হয়েছে। সে সময় পাক সেনদের হাতে গাইবান্ধার যারা শহীদ হন তারা হলেন- বিজয় কুমার রায়, পরেশ নাথ প্রসাদ, কেদার নাথ প্রসাদ, রামবুব সাহা, জগৎ কর্মকার, ননী সাহা, মদন মোহন দাস, উপেন্দ্র চন্দ্র রায়, যোগেশ চন্দ্র রায়, আনোয়ার ও নাম না জানা আরো অনেকে। স্টেডিয়ামের এই বধ্যভূমিতে পরবর্তীতে মাটি ভরাট কর উঁচু করা হয় এবং দক্ষিণ পাশের বাড়ির ভিতর বর্তমানে চাষাবাদ করা হচ্ছে। অবশ্য সেখানে এখনও কেউ বসবাস করে না।

ফুলছড়ি থানা সদরের দক্ষিণে রেল লাইনের ধারের বধ্যভূমিতে অসংখ্য মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে মাটি চাপা দেয়া হয়। কিন্তু সেই বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা না নেয়ায় তা এখন সাধারণের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। ফলে এই কবরস্থান দেখে এখন বোঝার উপায় নেই যে এটি বধ্যভূমি।

ঘোড়াঘাট সড়কের পাশে কিশোরগাড়ি বধ্যভূমিতে ১৯৭১ সালের ৯ জুন্কটি আবাদী জমিতে এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে পাক সেনারা ১৬২জন নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা কর। এছাড়া গোবিন্দগঞ্জের মহিমাগঞ্জে এবারত আকন্দ, সোবহান আকন্দ আঃ কাদের নামে তিনজন সমাজসেবীকে পাক সেনারা বাড়ি থেকে ডেকে এনে তাদের দিয়ে গর্ত খুঁড়ে নিয়ে

তাদেরকেই হত্যা করে সেই গর্তে পুঁতে রাখে। জেলার বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে পলাশবাড়ির কাসিয়াবাড়ির বধ্যভূমির ইতিহাস সবচেয়ে করুণ।

কিশোরগাড়ি ইউনিয়নের কাশিয়াবাড়ি এলাকার হত্যাযজ্ঞের কথা এখনও সবার মুখে মুখে ফেরে। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলার ২৭ জৈষ্ঠ, শুক্রবার দুপুর ১২টার পর ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা যখন জুম্মার নামাজ আদায় করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন- ঠিক সেই মুহূর্তে থানার কিশোরগাড়ি ইউনিযনের প্রত্যন্ত পল্লী এলাকার কাশিয়াবাড়ির আশে পাশের গ্রামগুলো ও পাশ্ববর্তী করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থানা এলাকা থেকে আসা পাকা হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরা এলাকাটি ঘিরে ফেলে। কাশিয়াবাড়ি হাইস্কুলের সেক্রেটারী ও সগুনা গ্রামের হারেছ আলী মন্ডল, কশিয়াবাড়ির আমান উল্যা মন্ডল রামবল্লভ, নজির উদ্দিন, বাহার উদ্দিন, আনছার আলী, রাজেন্দ্র নাথ, আকালু শেখ, রামচন্দ্রপুরের বিনোদ বিহারী, কিশোরগাড়ির শিক্ষক গোলজার রহমান, রামচন্দ্রপুরের অতুল চন্দ্র, কুমোদ চন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ , জাইতরের ক্ষুদিরাম, গৌরহরি, নরেন্দ্রনাথ এবং সিতারামসহ কাশিয়াবাড়ি এলাকার শত শত মানুষকে জোর কর ধরে এনে কাশিয়াবাড়ি হাইস্কুল মাঠে সমবেত করে এবঙ সেখান থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দক্ষিণে চতরা ঘোড়াঘাট সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে রামচন্দ্রপুর গ্রামে নিয়ে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

হত্যাকান্ড সেরে তারা আবার ফিরে যায় দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থানা এলাকায়। আর এ হত্যাকান্ডের স্থানে লাশের স্তুপের ভিতর থেকে অলৌকিকভবে বেঁচে যায় চকবালা গ্রামের দিন মজুর সাগীর আলী, সগুনা গ্রামের খোকা মন্ডলের পুত্র ৮ম শ্রেণীর ছাত্র বর্তমানে কাশিয়াবাড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক আনছার রহমান বাদশা মন্ডল ও বর্তমানে কাশিয়াবাড়ি পোস্ট অপিসের পিয়ন তৎকালীন স্কুল ছাত্র আমীর আলী। কাশিয়াবাড়ি এলাকার এ বধ্যভূমি ও গণকবরে এখন পর্যন্ত কোন ধরণের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়নি। তবে ১৯৯৬ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে রামচন্দ্রপুর গ্রামে এ বধ্যভূমি গণকবরের স্থানে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গাইবান্ধা জেলা পর্যায়ের ও পলাশবাড়ি থানা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা এসেছিলেন।

পলাশবাড়ির সর্বস্তরের মানুষের এবং থানা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক সহযোগিতায় বধ্যভূমি গণকবরের স্থানটি জমির মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করে সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। বর্তমানে কাশিয়াবাড়ি এলাকার পশ্চিম রামচন্দ্রপুর গ্রামের ৭১ এর বধ্যভূমি ও গণকবর অযত্নে অবহেলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্যঃ কতিপয় কুলাঙ্গার ছাড়া দেশের অধিকাংশ মানুষই একাত্ম ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সথে। আর প্রশিক্ষণ নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সাহসী সন্তানেরা। গাইবান্ধার ১ হাজার ২৯০ জন বীর সন্তান প্রশিক্ষণ নিয়ে মম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। থানা ভিত্তিক সংখ্যা হলোঃ সাঘাটা- ৩২৩ জন, ফুলছড়ি- ২০৫ জন, গাইবান্ধা সদর- ২৭৪ জন, গোবিন্দগঞ্জ- ৯৪ জন, পলাশবাড়ি- ৬৫ জন, সুন্দরগঞ্জ- ২৭২ জন এবঙ সাদুল্যাপুর-৫৭ জন। কোম্পানী কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (১) রোস্তম আলী খন্দকার, (২) মাহবুব এলাহী রঞ্জু, (৩) এম.এন, নবী লালু, (৪) আমিনুল ইসলাম সুজা, (৫) খায়রুল আলম, (৬) সুবেদার আলতাফ হোসেন। এছাড়া গাইবান্ধার মফিজুর রহমান খোকা এবং মফিজ উদ্দিন সরকার ৬নং সেক্টরে কোম্পানী কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বীরত্বসূচক ‘বীর উত্তম’ খেতাবে ভূষিত হন দুৎসাহসী নৌ কমান্ডো বদিউল আলম আর ‘বীর প্রতীক’ খেতাবে ভূষিত হন গাইবান্ধার দুই সাহসী সন্তান মাহবুব এলাহী রঞ্জু এবং এ টি এম খালেদ দুলু।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ যাঁরাঃ ১। নজরুল ইসলাম, পিতা- নিজাম উদ্দিন, মুন্সীপাড়া, ২। শহীদুল হক চৌধুরী, পিতা- আবু মোঃ ফজলুল করিম, স্টেশন রোড, ৩। মাহাবুবার রহমান, পিতা- মরহুম আঃ সালাম, কুপতলা, ৪। ফজলুর রহমান, পিতা- রশিদুর রহমান, পূর্বকোমরনই, ৫। নূরুন্নবী সরকার, পিতা- আঃ রহমান সরকার, ডেভিড কোম্পানী পাড়া, ৬। আবুল কাশেম, পিতা- ইসমাইল হোসেন, সাদুল্যাপুর সড়ক, ৭। আবুল হোসেন, পিতা- কালু সেখ, রিফাইতপুর, ৮। নবীর হোসেন, পিতা- রহম কামাল উদ্দিন, থানসিংপুর, ৯। আঃ সামাদ, চকবরুল, ১০। আলতাফ হোসেন, পিতা- গরিবউল্লাহ মন্ডল, রামনথের ভিটা, ১১। আবুল হোসেন, পিতা- কাইয়ুম হোসেন, রিফাইতপুর, ১২। আসাদুজ্জামান নবাব, পিতা- আজিজার রহমান, পশ্চিমপাড়া, ১৩। একেএম হামিদুর রহমান, পিতা- মোজাহার উদ্দিন, ফলিয়া, ১৪। সাবেদ আলী, পিতা- সমসের

আলী, গোবিন্দপুর হাটলক্ষ্মীপুর, ১৫। আহম্মদ আলী, পিতা- সমশের আলী, কুপতলা, ১৬। আনোয়ার হোসেন ও ১৭। খোকা (৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট) মানিক মহুরিপাড়া, গাইবান্ধা।

পলাশবাড়ি উপজেলাঃ ১৮। গোলাম রববানী, পিতা- ফরহাদ রববানী, আওরপাড়া, ১৯। আঞ্জু মন্ডল, পিতা- ইমান আলী, পবনাপুর, ২০। লতিফ, পিতা- হেলাল উদ্দিন সরকার, ছাতারপাড়া, ২১। আবুল কাশেম, পিতা- আব্দুল করিম প্রধান, ছাতারপাড়া,

সাদুল্যাপুর উপজেলাঃ ২২। আবু বক্কর সিদ্দিক, পিতা- বছির উদ্দিন, গ্রাম- ফরিদপুর।

ফুলছড়ি উপজেলাঃ ২৩। নায়ব উল্যাহ, পিতা- সাহেব উল্লা, উড়িয়া, ২৪। সহিদ উল্লাহ, গজারিয়া।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলাঃ ২৫। আজিজ, পিতা- বাবর উদ্দিন বেপারী, গ্রাম-ধুমাইটারী।

গোবিন্দগঞ্জ থানাঃ ২৬। জানমামুন, পিতা- জিতু মন্ডল, কাটাবাড়ী, ২৭। দেলোয়ার হোসেন, পিতা- আশরাফুল আলম, কাটাবাড়ি. ২৮। ভোলা সেখ, পিতা- জবেদ আলী, হামিদপুর, ২৯। গোলাম হায়দার, পিতা- সিরাজুল হক, জোগদহ, ৩০। তোবরক হোসেন মাজু, পিতা- মামতাজ আলী সরকার, গ্রাম- গণ্ঠপুর, ৩১। ফজলুল করিম, পিতা- দেলায়ার হোসেন, পুনতাইর, ৩২। মহেন্দ্র বরু, পিতা- দেবেন্দ্রনাথ, গোলাপবাগ বন্দর, ৩৩। মান্নান আকন্দ, পিতা- ওসমান আরী আকন্দ, গোলাপবাগ বন্দর, ৩৪। ফেরদৌস সরকার, পিতা- খালেক উদ্দিন সরকার, শাখাহার, ৩৫। আনোয়ার হোসেন, পিতা- হাছেন আলী সরকার, শাখাহার, ৩৬। সিরাজুল ইসলাম, পিতা- হাছেন আরী, শাখাহার, ৩৭। আলতাফ হোসেন, পিতা- মফিজ উদ্দিন, গোপালপুর, ৩৮। ওমর লাল চাকী, অমিত লাল চাকী, যাবেরাইপুর।

সাঘাটা উপজেলাঃ ৩৯। নাজিম উদ্দিন, পিতা- ইয়াকুব আলী, হালিমস বন্দি, ৪০। কাবেজ আরী, পিতা- ওমর আলী, কালাপানি, ৪১। আনছার আলী, পিতা- মজিদ, বানিয়া পাড়া, ৪২। হাফিজুর রহমান, ৪৩। তার সহোদর ভাই ৪৪। মজিবুর রহমান, পিতা- নাসির আলী, বামন গড়, ৪৫। হাই সরদার, পিতা- আব্দুল বাকি সরদার, ৪৬। শহীদত মোবারক আলী, পিতা হোসেন আলী, মাঘুড়া, ভরতখালী ও ৪৭। সোবহান আলী, পিতা- ইয়াছিন আলী, গ্রাম- আমদির পাড়া।

নরঘাতক পাকসেনারা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল থেকে শেষ বর্ষের ছাত্র ও ছাত্র ইউনিয়নের প্রচার সম্পাদক গাইবান্ধার বদিউল আলম চুনীকে ধরে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। শহীদ চুনি হানাদার শত্রুসেনাদের হাতে ধরা পড়ার পর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাহত হয়ে আজও যারা যন্ত্রণা ভোগ করছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হরেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম.এ মান্নান মিয়া, পিতা-পনির উদ্দিন, গ্রাম- শিমুলতাইড়, বাদিয়াখালী গাইবান্ধার আঃ রহমান, সাঘাটা থানার চান মিয়া সর্দার, পিতা- ঘুনু সরদার, বড়াইকান্দি, মহিমাগঞ্জ এবং আঃ কুদ্দুস, পিতা- মোমিন সরকার, গ্রাম- মোংলার পাড়া, জুমারবাড়ি, গাইবান্ধা।

এছাড়াও বেশকিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা যুদ্ধে আহত এবং শহীদ হয়েছেন যাঁদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বিজয় পর্বঃ

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো গাইবান্ধাতেও মুক্তিযোদ্ধা এবং পাক সেনাদের লড়াই অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে ২৭ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা খবর পায় পাকসেনারা গাইবান্ধা ছেড়ে চলে গেছে। ঐদিন মুক্তিযোদ্ধারা এগোতে থাকে এবং

রসুলপুরে স্লুইস গেট উড়িয়ে দেয়ার জন্য ডিনামাইট সেট করে। কিন্তু সেটা অকেজো হয়ে যায়। ওখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা কঞ্চিপাড়া আসে। রসদ ফুরিয়ে গেলে তাঁরা আবার রসুলপুরে পজিশন নেয়। পরদিন বিকাল ৪টায় পাক বিমান ঐ এলাকা এবং মোল্লার চরে বোমা বর্ষণ করে। আহত হয় বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। ৮ ডিসেম্বর সকালে ভারতীয় বিমান বাহিনীর দুটি বিমান গাইবান্ধা রেলস্টেশনের পাশে বোমা ফেলে এবং বিকেলে ট্যাংক নিয়ে মিত্রবাহিনী প্রবেশ করে শহরে। অপর দিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব এলাহী রঞ্জুর নেতৃত্বে দেড় শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা ৮ ডিসেম্বর কালাসোনার চর থেকে শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে রউফ মিয়ার বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন ৯ডিসেম্বর সকালে বিজয়ীর বেশে হাজার হাজার মানুষের আনন্দ উৎসবের মধ্যে শহরে প্রবেশ করে। ৯ ডিসেম্বর তৎকালীন এসডিও মাঠে এক গণ সংবর্ধনা দেযা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের। দশ হাজারের বেশী মানুষ ঐ সংবর্ধনায় উপস্থিত হয়। কোম্পানী কমান্ডার মাহবুব এলাহী রঞ্জু (বীর প্রতীক) তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে আনসার ক্যাম্পে অবস্থান গ্রহণ করেন। আরেক কোম্পানী কমান্ডার মফিজুর রহমান খোকা সুন্দরগঞ্জ থানা সদর মুক্ত করে ওখানে অবস্থান নেন।

গাইবান্ধা রণাঙ্গণে হানাদার বাহিনীর রাতের ঘুম হারাম করা কিংবদন্তীর মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানী কমান্ডার রোস্তম আলী খন্দকার ও কোম্পানী টুআইসি গৌতম চন্দ্র মোদকের নেতৃত্বে বেতলতলী গ্রামের মফিজ মন্ডলের বাড়ির হাইড আউট থেকে ৪৫০ জনের মুক্তিযোদ্ধা দল বিজয় উল্লাসে ৮ডিসেম্বর বিকালে বোনারপাড়ায় আসে। পথে হাজার হাজার নারী পুরুষ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আনন্দঅশ্রুর মধ্যে আবেগঘন পরিবেশে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে বরণ করেছিল সেদিন। এভাবেই গাইবান্ধা শহরসহ আশেপাশের এলাকা মুক্ত হয়। মুক্ত হয় অন্যান্য থানা।

তথ্যসূত্রঃ

১। ১১ নং সেক্টরের (রোস্তম কোম্পানী) সাবেক সহকারী কোম্পানী কমান্ডার গৌতম চন্দ্র মোদক, ২। মূলধারা'৭১-মঈদুল হাসান। ৩। আমরা স্বাধীন হলাম- কাজী সামসুজ্জামান। ৪। একাত্তরের ধ্বনি- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা এ্যাকশন কমান্ড কাউন্সিল, গাইবান্ধার প্রকাশনা। ৫। মুক্তিযুদ্ধের উত্তরত রণাঙ্গণ-উইং কমান্ডার (অব.) হামিদুল্লাহ খান, বীর প্রতীক- ভোরের কাগজ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯১। ৬। বাংলদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, গাইবান্ধা জেলা ইউনিট।

* দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য নিবন্ধের 'রণাঙ্গণের দুঃসাহসিক যুদ্ধ' শিরোনামের অন্তর্গত ৯নং যুদ্ধ থেকে ২৪ নং যুদ্ধের তথ্য প্রদান করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সাবেক সহকারী কোম্পানী কমান্ডার গৌতম চন্দ্র মোদক এবং 'গাইবান্ধার বধ্যভূমি' অংশে তথ্য সংযোজন করেছেন অমিতাভ দাশ হিমুন ও শাহাবুল শাহীন তোতা।

-সম্পাদক